প্রকাশক ঃ
শ্রীপরেশ চন্দ্র ভাওয়াল
বুক সিণ্ডিকেট প্রাঃ লিমিটেড-এর পক্ষে
২ রামনাথ বিশ্বাস লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীনিরঞ্জন চৌধুরী
রঘুনাথ প্রেস এর পক্ষে
৮৩বি, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা-৭০০০০৬

পরিবেশক ঃ
ক্যালকাটা বুক হাউস
১/১ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম সংস্করণ—ডিসেম্বর ১৩৬১

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীসুনীল শীল

উৎসর্গ ঃ

পরম স্নেহাস্পদ অনুজ
শ্রীমান সত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে

মেজদা

ময়ূরপংখি আকাশ ১
শান্তিনিকেতনে ৪
স্বগত ঃ পঁচিশে বৈশাখ ৬
আমি ৮
আমি যদি মেঘ হতাম ৯
নগর সন্ধ্যা ১০
বৃষ্টি-রাতের কবিতা ১২
যাত্রী ১৩
ঘুম ১৪
কোন এক শীতকালে ১৫
নব জন্ম ১৬
বাঁধা হরিণের প্রতি ১৭
নয়া কাল ১৮
ফ্যান দাও ২০
উট ২১
বোম্বাই ২২
জটিবুড়ির নববর্ষ ২৩
কথা ২৫
টেলিপ্রিণ্টার ২৮
তারা আসবে ৩২
সুকান্ত-স্মরণ ৩৪
কারার প্রার্থনা ৩৬
ইছামতী ৪২
ব্যারিকেডের কাব্য ৪৪
যৌবন ৪৮
পার্ক স্ট্রিটের স্ট্যাচু ৫২
সরলরেখার জন্য ৫৪
আমিও যন্ত্রণাকে ৫৫
'ময়না-পড়ো' পিসিমা ৫৭
তোমার মুখ আমি ৬০
ঋতু বদল ৬১
দেবদারু ও কৃষ্ণচূড়ার শোকে ৬৩
অন্য কারা যেন ৬৫
তুমবুনিতে সারা দুপুর ৬৮
দ্বিতীয় জন্ম ৬৯
গ্রহান্তর থেকে ৭২
তখন থেকে তারপর ৭৩
বাড়িটা ৭৪

জল নদী মাছ ৭৬
আমার মৃত্যুর জন্য ৭৮
মংপু ৮০
সাত মাইলের বাঁকে ৮১
দীপ্তি ও বিআত্রিচে ৮৩
পরদিন ৮৪
বাবু ও জটিবুড়ি ৮৮
মন্ত্রদ্রষ্টারঃ ৯০
পৃথিবীর মুখ ৯১
ভয়ংকর ঝড় ৯৩
শান্তনু-শ্যামলী ৯৫
ইজেল ও বুনো পারাবত ৯৮
দেহি পদপল্লবমু ১০০
মধুমান বনস্পতি ১০২
মহাদিগন্তের কবি ১০৪
কলকাতা কলকাতা কলকাতা ১০৬
শেষ চড়ুইভাতি ১১০
জংশনে এসে ১১২
পরিণতি ১১৩
দেখিনা বৃক্ষ ১১৩
অস্ফুট বারুদ ১১৫
ডায়াল টোন ১১৮
আমাকে খোঁড় ১১৯
তখনও মন ১২০
আমি বিশ্বস্ত আছি এবং ১২১
তিন বানর ও এক গোয়ালিনী ১২২
টিয়া পাখি ১২৩
সব করাঘাতগুলি ১২৪
এরোড্রামে সকাল ১২৫
দ্বিতীয় নাম ১২৬
শূন্য পুরাণ ১২৭
দেবদূতেরা ১২৯
জননী বাংলা ১৩১
কয়েকটি মাত্র নদী ১৩৩
দরজা ১৩৫
আত্মহত্যার পর ১৩৭
সে, বৃক্ষ এবং আমি ১৩৮
জলস্রোতে বিম্বোষ্ঠ ১৩৯

প্রত্যাবর্তন	১৪১
শেষ প্রতিকৃতি	১৪[illegible]
অ্যাখনও সূর্য	১৪৬
যখন তোমাকে	১৪৭
অগ্ন্যুৎপাতের পর	১৪৯
বিদ্যুৎ	১৫১
প্রতিধ্বনি	১৫২
ফ্রেজারগঞ্জে	১৫৪
মাছরাঙা	১৫৫
যথারীতি	১৫৬
বাঙ্ময়	১৫৯
অশ্বারোহ	১৬০
অলৌকিক ঘড়ি	১৬১
উতল জংশন	১৬২
সময় কবচকুণ্ডল ও রক্তগোলাপ	১৬২

জগন্নাথ চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ কবিতা

ময়ূরপংখি আকাশ

দিনের শেষে

ময়ূরপংখি আকাশ মেঘে এলোমেলো,
তার মাঝে এই বিহংগ-মন কি সুর পেলো!
দিনান্ত-রোদ গাঁয়ের পথে সোনা ঝরায়,
নেশা ধরায় মৃদুমন্দ,
হারাকালের অ্যাকেশিয়ার মধুগন্ধ।

রাত্রি যখন দিনের দেশে ঘুম আঁকে,
উন্মনারা কালো খোঁপায় ফুল রাখে,
কোমরে নীল শাড়ি জড়ায়
উঁচু আকাশ মুঠো মুঠো তারা ছড়ায়,
আমাদের এই তেপান্তরি বনগ্রামে,
ভীরু মেয়ের কাঁপা চোখে সন্ধ্যা নামে।

ছেলেভুলানো ছড়ার মতো এলোমেলো
অনেক কালের স্মৃতি মনকে ঠুকরে খেলো।
ছায়াচ্ছন্ন বনের ফাঁকে
ভগ্নাবশেষ নীলকুঠিতে ডাহুক ডাকে,
পতংগেরা ডানা কাঁপায় ঝাঁকে ঝাঁকে,
আমাদের এই বনগ্রামে
লজ্জাবতী লতার মতো রাত্রি নামে।

রাত পোহাল

জোড়া শালিখ বাবলা ডালে কিচির-মিচির,
চিকচিকে নীল আমলকি বন আলো ঝিরঝির;
নরমঢলো গত রাতের হিম-হাওয়ায়
চাঁদ পোহায়।

নদীর চরে কন্যা মেয়ে ঝিনুক কুড়ায়
বাতাসে তার শিউলিরঙা শাড়ি উড়ায়,
জোড়া শালিখ কিচির-মিচির বনচূড়ায়।
ভুঁইচাপা আর জুঁই ফোটে—
রোদ ওঠে।

নবগংগা নদীর জলে ঝিলিমিলি
হংসমিথুন শামুক তোলে নিরিবিলি।
ওপার গাঙে নোটন পায়রা ঝোটন নাড়ে,
বেলা বাড়ে।

এমনি করে আলো-সকাল প্রীতি হারায়,
কাশের তাড়ায় ;
এমনি করে কতো যে জুঁই
ফোটে শুধুই,
কতো যে দিন
রি--ন ঝি—ন
মেঘে মিলায়
সপ্তডিঙা সমুদ্রে শেষ স্নেহ বিলায়।
এমনি করে আমাদের এই বনগ্রামে
দুপুর নামে।

লাল দুপুর

নদীর চরে ধু—ধু,
মাথার পরে ঘু—ঘূ।
শানবাঁধানো গাজনতলার পৃষ্ঠে নামুক
রোদের চাবুক,
ঝাউয়ের বনে হাওয়া সে হোক হু—হু।

বিসদৃশ মাকড়শা তার জাল বোনে
এক কোণে,
মাছির মতো টিকটিকিটা ঘুরে বেড়ায়,
বোনকে দিদি ঘুম পাড়ায়।

আকাশ কাঁদে এরোপ্লেনে
টেনে টেনে।
মন যে গেল নিরুদ্দেশে
বিনিঃশেষে,
জাপানি রূপকথার মতো দ্বীপের দেশে।

তালখেজুরের নিচে দোলে শ্যাম পুকুর,
ঊর্ধ্বনীলে আবির ঢালে লাল দুপুর ;
নদীর চরে ধু—ধু,
কাশের বনে হাওয়া ফুঁ দেয় হু—হু।

আকাশ যেন অসংখ্য ঝাঁক মাছরাঙা,
নিচে গাঁয়ের জলন্ধরি নীল ডাঙা,
ওরা সেথায় ভিজে পাখার জল ঝাড়ে,
কেয়াকলির রং বাড়ে।

সেইখানে এক রাঙা অরুণ রোদ ঝরায়
মেঘাম্বরী মেয়ের চোখে রেণু ছড়ায় ;
কখনো বা সাতরঙা রামধনু গড়ায়।

দিন ফুরালে ছায়াচ্ছন্ন জলে স্থলে
সংগিহারা বিষণ্ণ এক তারা জ্বলে,
সন্ধ্যাবেলায় পাখিনি কোন্ ভীরু আশায়
ডানা ভাসায়।
অবিচ্ছিন্ন চাপা কান্না কাঁদে বাতাস,
শোনে আকাশ,
শুধু একটা তারা জ্বলে
নভস্তলে।

ময়ূরপংখি সেই আকাশের নীল চূড়ায়
বিহংগ-মন উড়ে উড়ে গ্লানি জুড়ায়।

শান্তিনিকেতনে

অপরাহ্ন

মহুয়ারাতের নিচে মাদলের ডিমি ডিমি তাল,
থরো থরো মেঘ নীল আকাশেরে করেছে মাতাল।
যে-আকাশ একদিন ভাষা খুঁজে পেয়েছিল প্রাণে,
কোনো এক অপরাহ্নে রবীন্দ্রনাথের কোনো গানে

স্তিমিত রাতের চোখে ছায়াচ্ছন্ন বিস্তীর্ণ বিষাদ,
কানায় কানায় ভরা কি বেদনা, কতো অবসাদ।

আজও সেই রাঙামাটি শ্রীনিকেতনের পথ ছাওয়া,
সেই ছোট ফোটা ফুল, শুধু নেই সেই গান গাওয়া।

শ্যামলীর ভরা খেত সংখ্যাহীন লতায় পাতায়
স্বাক্ষর আঁকে না আর মৃত্যুহীন কবির খাতায়।
বর্ষার ডম্বরু-সুর কাঁপে নাকো তম্বুরার পরে
মৃদংগ-সংগীত বুঝি মিশে আছে শ্রাবণের ঝড়ে।

সন্ধ্যা রাত

সাঁওতালি মেয়েটির কালো চুল ভয়াতুর চোখ
ভাল লাগে, বলি তাই —'কালো সে যতোই কালো হোক'
সহসা আকাশ কাঁপে, মনে পড়ে এ যে তাঁর কথা
কোপাই নদীর নিচে কানাকানি করে নীরবতা।

হংসবলাকার পাখা ঝিলমের স্রোতে আনে বেগ
মাটির পৃথিবী হয় অকস্মাৎ বৈশাখের মেঘ।
আবার ফুটেছে ফুল এবারের বিলম্ব-বর্ষায়
বনের জোনাকি যেন হারানো যৌবন ফিরে পায়।

'উদীচি'র বাতায়নে আকাশের বৃথা আনাগোনা
ঝিলিমিলি সন্ধ্যা রাতে সে গান যায়না আর শোনা।
পরিপূর্ণ প্রাণ-পাওয়া তরুশাখা ভাষা খুঁজে মরে
যে-ভাষা হারায়ে গেছে সেবারের শ্রাবণের ঝড়ে।

পরদিন সকাল

উত্তরায়ণের গায়ে প্রাতঃস্নাত আকাশের নীলা
অজস্র ধারায় ঝরে রবীন্দ্রনাথেরই যেন লীলা

ফুলেফলে মধু ঢালা ; চোখে নড়ে নিরন্ত বিস্ময়
মাধবীলতার মতো ভীরু মেঘ বুঝি কথা কয়।

দৃষ্টির বিহংগ তার পাখা ম্যালে দিগন্তের কোণে
যেখানে প্রভাত নামে মেহগনি মহুয়ার বনে।
যেখানে জারুল শাখে পথের আবির ধুলো ওড়ে
সাঁওতালি মাটি কাটে লাক্ষা-রাঙা উদয়ন ভোরে।

হাওয়ায় মশারি কাঁপে মৃদুমন্দ অ্যাকেশিয়া-হাওয়া,
পুবের বারান্দাটুকু হলুদ সোনালি রোদে নাওয়া।
হারানো কালের সেই নিরংশু আকাশ মনে পড়ে
যে-আকাশ উড়ে গেছে কোনো এক শ্রাবণের ঝড়ে

স্বগত : পঁচিশে বৈশাখ

আমার মনের পাখি বেদনার্ত অসংখ্য পাখায়
সূর্যের দুয়ারে এসে ভাষা চায়।
সেই ভাষা
কুমারীর উষ্ণ বুকে যে ভাষা ঘুমায়।
পাখি চায় সেই চেনা সুর
যে-সুরে সকাল আনে রোদের নূপুর,
সেই বাণী—
বিরহসন্ধ্যায় যার ভিরু কানাকানি ;

আমার মনের পাখি বৈশাখের অন্ধকার ঝড়ে
ভাষা খুঁজে মরে।

মনের মৌমাছি মোর শূন্যে ওড়ে তপন-লোলুপ,
মধু তার কবিতার খনি,
যে-কবিতা মানুষের প্রেম দিয়ে আঁকা
বিরহ-বলাকা—
যে-কবিতা স্বপ্ননীল তরুণীর বাহুর বন্ধনী।

মনের মৌমাছি মোর সৌরদিন নিভে গেলে পরে
আকাশের উপকূলে গান খুঁজে মরে।

আমার মনের পাখি হিজলশাখায়
আকাশের আলো ঠুকরায়।
সে চায় দু-ঠোঁট ভরে শুষে নিতে সমুদ্রসমান
বেদনার গান।
সে চায় নক্ষত্র থেকে মুছে নিতে সেই আলো-রেখ
যে-আলোক আগুন ছড়ায়ে
মেঘে মেঘে জ্বালায় বোশেখ।

আমার মনের পাখি বুকে তার রাত্রি দিন রয়
নরম পালকে মোড়া সূর্যের প্রণয়।

হে তপন! আমি যে জোনাকি,
মৃত্যুরে ডিঙিয়ে যাব এই আশা নিয়ে
তোমার আলোর পানে লোভাতুর চোখ মেলে থাকি

আমি

আমি যেন কোনো এক বনান্তের রাতের জোনাকি,
অথবা দিনের শেষে কোনো নীল আকাশের পাখি,
আমি যেন ছোট নদী বুকভরা ছোট ছোট ঢেউ,
যে-নদীতে স্নান করে গাঁয়ের মেয়েরা কেউ কেউ।

আমি যেন কোনো এক পথশ্রান্ত অচেনা পথিক,
দুদণ্ড তাকিয়ে থাকি যে-আকাশে আলো-ঝিকিমিক,
আমি যেন কতো বন, কতো মেঘ, কতো বালুতীর
অথবা অনেক রাতে একমুঠো চাঁদের আবির।

কাঁঠালি চাঁপার বনে অপরাহ্ন আঁকে তার ছায়া
'অরুণা' বোনের মতো ছোট এক শরমালু মায়া ;
ওপারে আকাশ আর নিচে এক স্নেহ-নীল বন
আমি যেন সেইখানে অরণ্যের সুরভি-যৌবন।

মনে হয় আমি যেন নাগিনীর নরম নির্মোক
আমি যেন হরিণীর পরিশ্রান্ত ভীরু দুই চোখ,
আমি যেন জুঁইফুল সকালের আলো-রোদ-নাওয়া,
হলুদ-শেফালি-গন্ধি হেমন্তের মৃদুমন্দ হাওয়া।

আমি যেন ঘুম, আর আমি যেন আকাশের তারা,
আমি যেন কালো চুল অন্ধকার বাতায়নে হারা ;
একালের সেকালের আমি যেন শংখচিল পাখি
মাটি ছোঁয়া পৃথিবীরে ডাকি আর ডাকি আর ডাকি

আমি যদি মেঘ হতাম

রেলিঙে ভর দিয়ে, আকাশের দিকে চেয়ে
মনে ভাবি, আমি যদি মেঘ হতাম !
ম্লান হয়ে আসা বিকেলের মতো বিষণ্ণ অথচ সুন্দর,
গংগার মতো বিস্তীর্ণ, পালকের মতো হালকা
বিদ্যুৎ দুমড়ানো একখানি মেঘ !

ঝোড়ো রাতে পোড়ো বাড়ির তলায়
যেখানে ব্যাং ডাকে, আলো জ্বলে না—লোক চলে না,
যেখানে বনের ইঁদুর মাটি খোঁড়ে, ডালের পাখি কাঠ ঠুকরায়,
সেই কাঁটানটের জট-পাকানো কালো উঠোনের মাথায়
খাকি রঙের একখানি মেঘ !

কারাকোরাম পার হয়ে হোয়াংহোর দক্ষিণ কূল বেয়ে
তিব্বতের পাখি যেখানে চিন সমুদ্রে নেয়ে ওঠে,
যেখানে জাহাজ এসে নোঙর ফ্যালে, ডুবুরি ঝিনুক তোলে,
ঝড় উঠলে সমুদ্রের পাখি ডাকাডাকি করে,
আমি যদি হতাম সেই প্রশান্তমহাসাগরের দ্বীপপ্রদক্ষিণ-করা
তাইফুনের নোনা মেঘ ।

উজ্জয়িনীর বাতায়নে কারা অমন অসংখ্য প্রদীপ জ্বালে ?
যুবতি মেয়ের চোখ-ঝলসানো উৎসব-রাতের প্রদীপ ?
প্রাগ্ ঐতিহাসিক কোনো বিরহ-সন্ধ্যায়
কেউ কেউ বীণা বুকে চেপে কান্নার গান গায়,

কেউ কেউ খোঁপা খুলে আলুথালু বাইরে এসে দাঁড়ায়,
তাদের মুখে ছায়া-দোলানো ঘুম-ভুলানো
আমি যদি কালিদাসের মেঘ হতাম !

নদীর ওপারে ঝড় থেমে যায় ;
এপারে মাঠের মতো প্রশস্ত রাত নামে ;
কার্নিশে, জানলায়, আলনায়, দেয়ালে
আকাশ-কানা-করা অস্পষ্ট ছাইরঙের রাত,—
রেলিঙে ভর দিয়ে শুধু ভাবি
আমি যদি মেঘ হতাম !

নগর সন্ধ্যা

অগুনতি ফাল্গুন ছিল তোমার দিঘল চোখ জুড়ে,
বসন্তকালের পাখি ছিল সে তোমারই বনচূড়ে,
আকাশের মেঘ আর তোমার চুলের মেঘ মিলে
একখানি মায়া ছিল টলোমলো জলন্ধর বিলে।

সে-গ্রাম অনেক দূরে—এ আমার সমর্থ শহর
এখানে মুখর পথ, রাত হল প্রথম প্রহর ;
এখানে মাঘের শীত গাঁয়ের ফাল্গুন শুধু মায়া
এখানে গোধূলি নেই, আছে শুধু পথচারী ছায়া।

এখানে ছড়ানো নেই নীলারণ্য অথই আকাশ
দুপায়ে জড়ানো নেই এলোমেলো কচি কচি ঘাস,

বনের বিস্তার নেই—অফুরন্ত জারুল পাইন।
তোমার পায়ের নিচে গ্রাম নয়, ট্রামের লাইন।

তবু দ্যাখো, আমাদের শানবাঁধা শহরের নিচে
হারানো কালের সেই বিরহীর বেদন কাঁদিছে।
কিছু মেঘ কিছু তারা কিছু কিছু রাতের কুয়াশা
বুকের তলায় নাচা কিছু কিছু ভিরু ভালবাসা,

কিছু ছায়া, কিছু মায়া, এখনও চোখের কোণে নাচে
অনাদি কালের সেই চাঁদের জোয়ার আজও আছে।

তোমার যৌবন নিয়ে শহর যুবতি হল আজ
তোমার শরীর ছুঁয়ে রানি হল নগরীর সাঁঝ,
তোমার অলকবেণি দোলে আজ সাপুড়ে হাওয়ায়
তোমার চোখের তারা আলো দ্যায় তারায় তারায়।

যদিও নগর জুড়ে নামে হিম পাইথন রাত
বুকের আগুন ছোঁয় তোমার নরম দুই হাত।
এখানে ওড়েনি আজ শালিখ বা শংখচিল পাখি
ক্ষতি নেই, উড়েছিল পল্লব-সুনীল দুই আঁখি।

তোমার সর্বাংগ ছেয়ে পাতা এক নদী-ডাঙা গ্রাম
সেখানে সবুজ মাঠ কালো নীল আমলকি জাম—

আমি সেই গ্রাম ছুঁয়ে ভুলে গেছি নগরের ভার
গড়েছি পিচের পথ স্বপ্ন দিয়ে তোমার আমার।

তোমার গ্রামের দেশ—কি হবে সে গ্রাম দিয়ে বলো ?
শহরের ঢালু রাত সেখানে শয়ন পাতি চলো।

ভুলে যাও দেবদারু ভুলে যাও অজস্র পাইন,
তোমার পায়ের নিচে গ্রাম নয়, ট্রামের লাইন।

বৃষ্টি-রাতের কবিতা

লাল বারান্দার বাইরে বৃষ্টি
টাপুর টুপুর,
জল-ঝনঝন মেঘের নূপুর ;

জামরুলের কচিপাতা ঝিরঝির,
মাটিতে ঘাস শিরশির,
শরতের শিউলি-গন্ধা হাওয়া,
মেঘের দেশে দুচোখ তুলে চাওয়া

হঠাৎ চমকায়,
মেঘ নয়—
মন,
জলের ঝাপটার মতো ঝনঝন
কোনো এক দৃষ্টি-নির্ভর ক্ষণ।

কচি কলাপাতা-সন্ধ্যায়
বন-মর্মর বৃষ্টির গান গায় ;

হঠাৎ চমকায়,
মেঘ নয়—
মন,
মাধবীলতার মতো স্মৃতি—
জলের ঝাপটার মতো ঝনঝন
কোনো এক প্রীতি-নির্ভর ক্ষণ

যাত্রী

নিবিড় রাতের মতো প্রেম,
বটের ছায়ার মতো ভয়—
তারে ফেলে কোথা চল্লেম
বুকে নিয়ে বাঁকা সংশয় ?

মাঠের ওপর দিয়ে ট্রেন—
মেঘ, আর মাটি, আর আলো ;
পিছনের স্মৃতি যেন শ্যেন
পাখা নাড়ে ; ভালো, সে কি ভালো

কোনো এক বিদায়ি-রাতের
ক্ষণিকের ছোট ম্লান হাসি,
রিনিঝিনি নরম হাতের
হারানো আওয়াজ আসে ভাসি।

ঝাঁঝাঁ রোদে মধ্যদিনের
আকাশের নিচে চলে গাড়ি—

মনে পড়ে গ্রাম-প্রান্তের
নিরিবিলি স্নেহ-নীল শাড়ি।

লতার ডগার মতো প্রেম,
ফড়িঙের ডানা সম ভয়—
তারে ফেলে কোথা চল্লেম
বুকে নিয়ে বাঁকা সংশয় ?

ঘুম

অস্তবেলায় মেঘে মেঘে আগুন লাগে লাগে
কালো পাহাড়চূড়া ঘিরে স্বপন সব জাগে,
কলকণ্ঠি ছোট্ট নদী ছন্দে যায় নেচে
পুরানো দিন হারানো দিন সহসা ওঠে বেঁচে,
নুড়ি কুড়ায় নির্ঝরিণী শীর্ণ দুই কূলে
জোনাক তার বাতি জ্বালায় রাতের ঘুম ভুলে ;
পূর্ণিমার শূন্যাকাশে আলোর বান ডাকা
মেঘের ফাঁকে থাকে থাকে চাঁদের ঢেউ আঁকা ;
বাংলাদেশে সন্ধ্যা নামে গাঁদাফুলের বনে
সন্ধ্যা নামে বাতায়নে নামে মনের কোণে,
আমের বনে অন্ধকার, আকাশে শুকতারা,
গাঁয়ের পথে বন্ধ দ্বার, দিনের কাজ সারা।

'অরুণা' বোন মৃদুমধুর কালো কাজল আঁখি
স্বপনপরী সেখানে যায় নরম ঘুম রাখি,

বুকের ঘুম সুখের ঘুম চোখের ঘুম দোলে
ঘুমের ঘুম দেহ এলায় মা-জননীর কোলে ;

কোন এক শীতকালে

উঠোনে খড় শুকোয়, চিল ওড়ে,
জলপাই গাছে চড়াই ডাকে,
কুমোরে হাঁড়ি গড়ায়,
আমলকির পাতা ঝরে,
ভাবতে ভয় করে যে, সে নেই,
মন কেমন করে,
তবু—
দিন কাটাই।

মাঠে যাই,
কালো গাইকে ঘাস খাওয়াই,
মাষকলাইয়ের খেত বেয়ে শীত নামে,
জলন্ধর বিলে জল শুকোয়,
পানকৌড়ি পাখা নাড়ায়,
ভাবতে ভয় করে যে, সে নেই,
মন কেমন করে,
তবু—
মাঠে যাই।

দাওয়ায় বসি,
কি জানি

পিদিম জ্বালতে গিয়ে কান্না পায়,
হাত কাঁপে,
রাতের দিকে তাকাই—
প্রকাণ্ড অন্ধকার,
মনে হয় পোহাবেনা।

মাদুর পাতি,
অনেক রাতে আবার গুটিয়ে রাখি,
হাওয়ায় বাতি নেভে,
মনে পড়ে যে, সে নেই—
কান্না পায়।

নব জন্ম

জীবনটাকে মুঠোয় পুরে বেরিয়ে এলাম,
কালো ঝড় আর নীল তুফানও পেরিয়ে এলাম.
শান্তি না হোক, পরিপূর্ণ জীবন পেলাম।

ইচ্ছেমতো তৈরিকরা জীবনটাকে
ইচ্ছে করে উড়িয়ে দিলাম লক্ষ ঝাঁকে
ঝড়ের মুখে সন্ধ্যাধূসর ঘূর্ণিপাকে।

জীবনটা তো নতুন করে সৃষ্টি করায়,
নইলে শুধু দিন কাটানো বসুন্ধরায়
মৃত্যু সে তো। জীবন শুধু অকুণ্ঠতায়।

ভাগ্য যাদের ঝঞ্ঝা দিয়ে খোদাই করা
ওড়ায় তারা ঘুঁনধরানো জীর্ণ জরা
তাদের ছোঁয়ায় ধরিত্রী যে নৃত্যপরা
যুগবদলের অগ্রনায়ক দুয়ার খোলো।

বাঁধা হরিণের প্রতি

স্বপ্নে নাচে
মায়া নূপুর
তৃণাংকুরে,
শিকারিরা
শিঙা বাজায়
দূরে - দূরে ;

মৃগয়া-রাত
ঘুম-পাহাড়ে
কালো গুহায়
বুঝি পোহায়,
বুঝি পোহায়, বুঝি পোহায় !

বন-চূড়ায়
মৃদু গন্ধ
কারা ছড়ায় ?

চোখে এ কোন্
মুক্তি-হাওয়া
   মায়া জড়ায় ?

বাঁধা হরিণ, বাঁধা হরিণ.
কেঁদো নাকো,
ডানা ভাসায়
বিহংগমী
   চেয়ে দ্যাখো ;

লগ্ন এলো
লঘু পায়ের
সঞ্চরণী
এলো তোমার
ঘুমোত্তীর্ণ
   আগমনী ।

নয়া কাল

পৃথিবীর মাটির পাহাড়ে
নতুন উদয়-সূর্য ঘুম কাড়ে,
ভোর ভাঙে মানুষের হাড়ে হাড়ে ।

পুরানো কালের রাত নিভে যায়
নতুন সমুদ্রতীরে পাখির সাড়ায়,
আকাশ তাকায় নীল মেঘের পাড়ায়

কখন জোয়ার আসে
নীলাম্বু-ঢেউয়ের মতো বালুচর-ভাঙা,
নেয়ে ওঠে সকালের ডাঙা—
মীনাক্ষি-আকাশ রোদ-রাঙা।

পুরানো হাঙর-রাত অতল সমুদ্রে ডুবে যায়,
কলংকি-চাঁদের আয়ু দিগন্তের আকাশে হারায়;
কালের নৌকায় লাগে সামুদ্রিক হাওয়া—
বালুচর আলো-রোদ-নাওয়া।

নতুন মানুষ এল চোখে নিয়ে নতুন আকাশ
নতুন বিস্ময়
বুকে নিয়ে এল তার নতুন কালের
পথের সঞ্চয়।

কতো মেঘ এল গেল, কতো মেঘ, কতো কালো মেঘ
পুরানো মাটির তলে রেখে গেল নতুন আবেগ,
একাল দিয়েছে এঁকে তরুণের চির-অধিকার,
নতুন পৃথিবী বানাবার
স্বপ্ন তার।

পৃথিবীর মাটির পাহাড়ে
নতুন উদয়-সূর্য ঘুম কাড়ে,
ভোর ভাঙে মানুষের হাড়ে হাড়ে।

ফ্যান দাও

নীলা শাড়ি পিয়ানো বাজায়
রাত নামে টুং টাং টুং টাং
আঁটোসাঁটো খোঁপা-আটা যৌবন
সৌখিনা মন তার উন্মন।

কালো রাতে চলে নর-কংকাল ;
এরা কারা ? ফিসফাস কথা কয় ?
শহরের বোবা চোখে ঘুম নেই
মড়কের ভয় মনে দুর্জয়।

বর্গীরা সোনা-খেতে হানা দেয়
খামারের লোভে ভাঙে পিঞ্জর,
গরিবের প্রাণ করে লুণ্ঠন
অভিজাত কিন্নরী-কিন্নর।

পৃথিবীর সাথে নেই যোগাযোগ—
নাচে, হাসে, ভালবাসে, গান গায়,
বড়লোক—ওরা বড় ভাল লোক—
সুজাতারা পিয়ানো বাজায়।

পাথরের পুরী দ্বাররুদ্ধ,
দেউলিয়া মানুষেরা ফ্যান চায়,

লাখে লাখে লোক মরে বাইরে,
যক্ষেরা একা ধন আগলায়।

গত সনে বাঁধভাঙা বন্যায়
যদিও বা পেয়েছিল রক্ষে,
ফেরারি সে-প্রাণটুকু নিভে যায়
এবারের কালো দুর্ভিক্ষে।

নীলাপরী গুণবতী বীণা রাও
ফাঁকে ফাঁকে ছায়া দ্যাখে আয়নায়,
তারপর পিয়ানো বাজায়—
বাড়ি কাঁপে, 'ফ্যান দাও, ফ্যান দাও'।

উট

শাহারায় ফুটন্ত দুপুর,
চক্রবালে বালুর পাহাড়,
মরু-মরীচিকা রচে ছায়াচ্ছন্ন স্বপ্ন-ওয়েসিস ;
ক্যারাভান-হারানো উটের
বিকট চিৎকারে ভাঙে মরুভূর নিরন্ধ্র রোদ্দুর।

কদাকার কর্কশ প্রবীণ
চতুষ্পদ মরুপোত বালুচরে হানে খুরাঘাত—
বেদনায় সূর্য ওঠে হেসে
ঊর্ধ্ব-মহাকাশে।

উচ্ছৃংখল আরোহীর বেদুইন বাহু
দিয়েছিল সযত্নে প্রচুর
রজ্জুর বন্ধন,
কতদূরে—কে জানে কোথায়—
বালুঝড়ে সে আরোহী উড়ে গেছে,
উষ্ট্র তবু অবাধ স্বাধীন
নির্জলা যাত্রার পথে
নাসারন্ধ্রে উষ্ণ বালু চাপি
করিছে সে মরু অতিক্রম।

হে আরব আরোহী দুর্বার,
পদতলে কাঁদিছে কবর :
ক্যারাভান উড়ে যায় ঝড়ে,
তবু হের চলে সে মন্থর
—কুব্জপৃষ্ঠ, ন্যুব্জ দেহ, শতাব্দীর উট

বোম্বাই

কলকাতা চট্টল করাচি ও বোম্বাই
বিদ্রোহী আজ গোটা হিন্দুস্থানটাই :
চল্লিশ কোটি শোনে 'বাহাদুর'-কাহিনী—
ভারতের বীরপ্রাণ বীর নৌবাহিনী
শুরু করে মুক্তি লড়াই !

শহরে ও জনপদে জনগণ তৈয়ার,
শক্তির ভ্রূকুটিতে শংকিত নই আর,

'স্বাধিকার'—দশ হাজার নাবিকের পণ তা,-
মানবো না নতি ভয়ে ভাঙবো না জনতা
—আজাদির কঠিন কড়ার।

দুঃসহ শাসনের চির-অবসান চাই
জান দিয়ে জান রাখো মজুর কৃষাণ ভাই,
বোম্বাই করাচিতে জ্বলল যে দাবানল
সাম্রাজ্যের ভিত সে-আগুনে টলোমল—
হবে জিত মুক্তি লড়াই।

জটিবুড়ির নববর্ষ

আজও সেই ভাঙা বেড়া, শূন্য খেত, ছিন্ন চাল
—আর কতোকাল ?
হা ঈশ্বর ! খুঁটেখাওয়া বোঝাবওয়া, দুঃখসওয়া আর কতোকাল ?
হা হা করে রিক্ত ঘর,
নিষ্ফসল মাঠ, শূন্য লোকালয়, শ্মশান বন্দর
মনে হয় এ সংসারে সমস্ত উঠোন জুড়ে
পাতা এক নির্মম কবর।

ওরা বলে—
কেটে গেছে মন্বন্তর,

গিয়েছে আকাল,
থেমেছে লড়াই ।
হা ঈশ্বর !—হোক তাই, হোক তাই ।

দুপুরে দাওয়ায় বসে সুতো কাটি ;
ক্লান্তমন, হু হু করে বুক,
কেবলই যে মনে পড়ে সেই কচি মুখ,,
ফ্যান চেয়ে মরে যাওয়া ডোমেদের মেয়ে এতোটুক !

বংশীর জোয়ান ছেলে বউ ফেলে যুদ্ধে গ্যাল—
আর এল না সে,
রতন সর্দার—
কৃষক-সমিতি-গড়া আন্দোলনে জেল হল তার ;

হা ঈশ্বর ! তোমার সরকারে
নির্যাতন কতোকাল আর ?
আকাশে তুলোর মতো শাদা শাদা রোদ
নিচেয় গোয়াল শূন্য, মাঠে ধান নেই,
জোড়াতালি জীবনের খেই
হারায়,—
হায় !
হায় রে কপাল !
কান্নার বেসাতি নিয়ে আর কতোকাল ?

আজকে চৈত্রের শেষে
ভেসে এল আর এক বোশেখ,
কই, তবু কই,

রোমন্থনক্লান্ত এই ভীত-ভীত জীবনের
স্বাদ ফেরেনি তো ?
পুরোনো ব্যথার রাত পোহায়নি, শুকায়নি ক্ষত,
হায় !
হায়রে কপাল,
আজও সেই ভাঙা বেড়া শূন্য খেত, ছিন্ন চাল
—আর কতোকাল ?

কথা

কথা কি স্বপ্ন ?   কিসের স্বপ্ন ?
সে কি দীপমালা তারার শিখায় ?
এলোমেলো ছেঁড়া কুজ্ঝটিকায়
কথা কি পুবের আকাশস্পর্শ ?
কথা কি দুপুর প্রান্তর জুড়ে রোদের নূপুর ?
সে কি ঘুম ?   সে কি ঘুমের গহন
গম্বুজে জ্বলা আকাশপ্রদীপ—
শুকতারাটিপ ?
কথা কি সন্ধ্যাভেঙেপড়া বনে
রজনীগন্ধা ?

কথা তো কবিতা ফুলের, ফলের, ঝরনাজলের
পাঁপড়িতে মোড়া বিহ্বল মধু পুষ্পদলের ।

কথা সুগভীর
রক্তাভ রং অস্তরবির
কথা বনে বনে গন্ধ হাওয়ায়
কথা মনে মনে অন্য মনের স্পর্শ পাওয়ায়।
সে তো গান নয়, গানের তৃপ্তি,
মধু নয়, যেন আরও সুমধুর—
ধ্বনি নয়, ঘন ব্যঞ্জনাভরা গুঞ্জন সুর।

যুগ যুগ ধরে কথা জড়ো হয়, কথারা মিলায়,
চিতোর ইলোরা পাহাড়-গুহায় আকাশ-শিলায়
কানাকানি করে বাঙ্ময় মন, মিশর-চূড়ায়
সুপ্ত মমিরা স্বপ্নকথার কেতন উড়ায় ;
সব দেহহীন স্বপ্নের দেহ আজ তারা কথা
লক্ষ যুগের উত্তাপলাগা বিচিত্র ব্যথা।

কথা কি শান্ত যমুনার জলে দেওদার ছায়া
অপরাহ্নিক রক্তিম মায়া ?
হ্রদের গভীরে মাঝের মতন ঝাঁক বেঁধে চলা
ঝিকিমিকি কালো অক্ষর শাদা রোদ্দুরে জ্বলা ?
কথা কি কেবল কুশল প্রশ্ন—শুধু 'ভালো আছি' ?
কথা কি মনের সংগে মনের শুধু কানামাছি ?

রোদে-মেলে-দেওয়া শুকনো ধানের ঝন ঝন গানে
নিত্য-নূতন কথা পায় সুর কথা পায় মানে।
কথা যেন মাঠ যেখানে অনেক রোপা ধান ফলে
কান্নার জলে, বন্যার জলে।

ময়ূর মেলেছে পেখম যেখানে মেঘের সাড়ায়
কথার ময়ূর সেখানে সেও কি থমকে দাঁড়ায় ?
রামধনু-আঁকা পাখা মেলে সেও নেচে ওঠে না কি ?
বিষ্টির ছাটে ভিজে পুড়ে ফের বেঁচে ওঠে না কি ?

আকাশে ঝড়ের মৃদংগ বাজে উত্তেজনায়
সমতল মাঠে জলভরা মেঘে বৃষ্টি ঘনায়।

ঝড় কি মেঘের উদ্বেল কথা
বজ্রে চকিত বিদ্যুন্মালা—
ক্ষুব্ধ নীলের দুর্নিরীক্ষ, দুঃসহ জ্বালা ?

কথা আমাদের ধানভরা মাঠ
গানভরা মাটি—
আমরা সেখানে কেউ মাটি খুঁড়ি, কেউ ধান কাটি,
কেউ মই দিই,
গ্রাম থেকে গ্রাম কেউ ঢেলা ভাঙি, কেউ পথ হাঁটি,
দপদপ করে রুক্ষ পৃথিবী চলায় চলায়,
ধিকিধিকি জ্বলে আগ্নেয়গিরি মাঠের তলায় ;
কথা কি মাঠের গহ্বরে সেই অগ্নিপ্রবাহ,
অন্তর্দাহ ?

কথা উচ্ছল অন্তবিহীন
শান্তি মিছিলে চলমান মুখ,
কথা উদ্বেল জলের মতন
রসে ভরোভরো ফলের মতন
চির নূতনের সুখ।

কথা প্রাণভরা গানের স্বপ্ন,
কথা গানভরা প্রাণের স্বপ্ন,
কথা ক্লান্তির জট ছিঁড়ে ফেলা
মহাপৃথিবীর শান্তির মহাভাষা
কথা মানুষের ছোট ছোট নীড়ে আকাশস্পর্শী
অনন্ত ভালবাসা।

টেলিপ্রিণ্টার

রাত্রি এখন সবে দুটো বেজে পনেরো মিনিট,
টেবিলে কনুই, চেয়ারে ঠেকেছে নীলদাঁড়া পিঠ ;
নিষ্প্রাণ মন, গতানুগতিক সাংবাদিকতা—
কালো মৃত্যুর কিনার-ঘেঁষা এ ঝুটা জীবনটা।
সম্পাদককে পার তো শুধাও,
চাকুরিলীলায় তেইশ বছর হয়েছে উধাও
এই অফিসের কড়িকাঠ সিঁড়ি রেলিং বেয়ারা যতো
নখের ডগায় গুণে দিতে পারি নামতার মতো ;
এই হাড়ভাঙা আয়ুখোয়ানোর চাকুরি হেন
কেন ?

শহরে যখন স্বপ্নের রোদ ঢালে উত্তাপ
আমার টেবিলে ঘনায় তখন কালো অভিশাপ,

আসন্ন উষা, তারই সমারোহ সভয়ে সাজানো,
চায়ের প্রহরে পাঁপরের মতো পত্রিকাখানও
যাতে শোভা পায়, রাত জেগে করি তাই প্রত্যহ
এ দুর্বিষহ।

তেইশ বছর কতো রাত জেগে বেছেছি খবর
খুঁজেছি খবর
খুঁটেছি খবর
সংবৎসর।
অনেক ঘটনা রটনা করেছে উঁচু শিরোনামা
রোটারি প্রেসের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে ওঠা আর নামা
অনেক করেছি এ-জীবন ধরে
সারারাত শেষে কাগজ ছেড়েছি ট্রাম-ছাড়া ভোরে।
তবু—
এই হাঁটুভাঙা জীবনটা ভরে ছিল এক খুশি—
ঘেঁটে রাতদিন ঘটনার ভুসি
দিনে দিনে আমি লিখেছি কালের ইতিহাসখানি।
তবু কি তা জানি—

অষ্টপ্রহর এত যে খবর আসে আর আসে
টেবিলের পাশে,
এত যে জীবন পৃথিবীর পর কুঁড়ি হয়ে ফোটে
এত আধুনিক হাওয়াই জাহাজ ধুলো হয়ে লোটে,
এত মানুষের খুলি-উড়ে-যাওয়া ভিটে-পুড়ে-যাওয়া

হাহাকার রাত,
এত ভালবাসা, এত সংঘাত,

আমি কি শুধুই সেই জীবনের সংবাদবহ
এই দুঃসহ ?

এত সংবাদ গ্রীসের পাহাড়ে মিশরে জাভায়
ইন্দোনেশিয়া ইরানের হাওয়া দুনিয়া কাঁপায়,
বহুজনতার স্লোগানে মুখর টেলিপ্রিণ্টার !
আমি এ-জীবনে অসংখ্যবার
তোমার সংগে রাত্রি জেগেছি টেলিপ্রিণ্টার !
আর
আশা ছিল মনে
একদিন কোনও আচমকা ক্ষণে
আমার খবর পক্ষী হয়ে উড়ে আসবে এখানে ;
তেইশ বছর রক্তের দাগে তিলে তিলে লেখা
সেই যে খবর তার সংগে কি হবে নাকো দেখা ?
সিসের গুলিতে প্রাণ দেওয়া যদি সংবাদ হয়
আমার জীবন তবে কেন নয় ?
সিসের ধোঁয়ায় অকালে শুকানো আমার জীবন
বলো কম কিসে ?
তেইশ বছর রুখেছি মৃত্যু, মরিনি বিষে।

যারা দেশে দেশে দস্যুতা করে বোমা ফেলে গুঁড়ো
করেছে শহর
লাল ইয়েনানে পাঠায়েছে পীত বিমান বহর
বেঅনেট দিয়ে গড়েছে খবর
রয়টার শুধু তাদেরই কথায় মুখর হেন
কেন ?

অনেক ফানুশ কালের হাওয়ায় ছিঁড়ে ছিঁড়ে গেছে,
অনেক কিস্তি মাত্‌ হয়ে গ্যাল, আমি আছি বেঁচে
রাত জেগে জেগে চলেছি সমানে সংবাদ বেছে।

বোমার বছর, দাংগার রাত, জেগে কাটালাম ;
ঘুঘু মালিকের লাভের অংক খেটে বাড়ালাম,
বিনিময়ে আমি শিরে টাক ছাড়া কিই বা পেলাম ?
টেলিপ্রিন্টার !   শোনো,
দুঃখ সয়েছি, তবুও তোমার মুখ চেয়ে শুধু
বুকে আশা বেঁধে রেখেছি অ্যাখনও,
ভেবেছি মনে
সেই শুভ রাত আসন্ন বুঝি অ্যাখনই হল ;
পরমায়ু যায়—গিয়েছে—গ্যাল—
ভেবেছি তবুও সেই খবরের লগ্ন কখন হবে,
আমার জীবন-সংগ্রাম কবে
তোমার যন্ত্র-জিহ্বায় বেজে উঠবে উঠবে
রাত্রিশেষের চাঁদের মতন উর্ধ্বে ফুটবে
এ জীবন-নভে—
কখন ?   কবে ?

আজ অ্যাতকাল পর
কি আশ্চর্য, এল বাঞ্ছিত সেই খবর
খট্‌-খট্‌ খট্‌ খট্‌-খট্‌-খট্‌
সারা কলকাতা নগরীর প্রেসে কাল থেকে শুরু ধর্মঘট।
টেলিপ্রিন্টার কথা কয়ে যাবে মধ্য রাতে
বসবে পাহারা অফিসের নিচে রাইফেল হাতে
সাংবাদিকরা জাগব না আর সংবাদ সাথে,

খট্-খট্-খট্
কলকাতা রবে নিঃসংবাদ, নয়া সংকট।

বিগত তেইশ বছরে যা কিছু
ছেপেছি খবর শিরদাঁড়া বেঁকে মাথা করে নিচু
আজকে সে-সব অসার ঠেকছে,
জীবনকে আজ নতুন আলোকে
সার্থক করে পেলাম,
অ্যাক মিনিটেই তেইশ বছর ডিঙিয়ে এলাম।
ইন্দোনেশিয়া, বোম্বাই, চিন, সার্থক—
তবু
আমার জীবনে সব চেয়ে সার্থক
একটি খবর, আমার লড়াই আমার ধর্মঘট,
সে-খবর আজ টেলিপ্রিন্টারে দিল এ-পি-আই
কালকে অফিসে তালা নির্ঘাত্, কোনও কাজ নাই

তারা আসবে

তারা আসবে—আজ না হোক কাল—
        আমাদের এই গাঁয়ে
তারা আসবে কাঁটানটের কাঁটা
        সরিয়ে পায়ে পায়ে,

শুকনো খালে যারা তুলবে পাল
আনবে সারি গান
নবান্নের নীল আকাশ ভেঙে
হলুদ অঘ্রান,
তাদের নামে লিখেছি এই চিঠি
ছেঁড়া পাতার পত্র
আমার সই দিয়েছি, তুমি দাও
তোমার স্বাক্ষর।

তারা আসবে কালোমাটির গোর
দুহাত দিয়ে ঠেলে
তারা আসবে অন্ধকার দেশে
মশাল জ্বেলে জ্বেলে
তারা আসবে সপ্তডিঙা তরী
ভাসিয়ে দিয়ে জলে
তারা আসবে আশায় উজ্জ্বল
নীল আকাশের তলে।

তারা আসবে অনেক পথ হেঁটে
অনেক রাত জেগে
তারা আসবে বর্ষা জল ভেঙে
দীর্ঘ এঁকেবেঁকে।

তারা আসবে শিল্পি-মানসের
স্বপনে ভর দিয়ে
তারা আসবে সকল কাব্যের
সফল কথা নিয়ে।

আসবে তারা যেমন করে ঋতু
আসে অ্যাকের পর
গংগা হয়ে নামে যেমন করে
পাহাড়ি নির্ঝর।
তারা আসবে অনেক ক্লান্তির
অনেক ঘাম ফেলে
অনেকবার অনেক ময়দানে
অনেক প্রাণ ঢেলে।
তারা আসবে—জানি তো আসবেই—
আজ না হোক কাল
আসবে তারা সরিয়ে পায়ে পায়ে
পথের জঞ্জাল।

তাই তো আমি লিখেছি এই চিঠি
ছেঁড়া পাতার পর
আমার সই দিয়েছি, তুমি দাও
তোমার স্বাক্ষর।

সুকান্ত-স্মরণ

তখনও অন্ধকার কাটে নি যখন তোমাকে আমরা হারালাম
তখনও ভোরের নীড়কে সূর্যের ওম এসে জড়িয়ে ধরেনি,
কুয়াশার মশারি ভেদ করে কেবল দু একটি জোনাকি
রাত্রির অন্ধকার ছিঁড়ে ছিঁড়ে কেবল দু একটি তারা
ভাঙা ভাঙা গলায় কেবল দু একটি পাখি।

ভোর রাতের অন্য পাখিরা কতবার ডানা আছড়ালাম
কিন্তু তোমার বুক থেকে সেদিন বিষের তীর আমরা তুলতে পারিনি,
আমাদের ছোট ছোট পালকের উত্তাপে তোমার শীত ভাঙল না
কেবল মুমূর্ষু ঠোঁট আমাদেরই কান্নার জলে ভিজে উঠল।

তখনও অন্ধকার ছড়ানো যখন তোমাকে আমরা হারাই
তাই সূর্যের দুয়ারে আমরা ধর্‌না দিই নি,
দিতে পারি নি।
মৃত্যুর শীত তোমার বুকের ওপর কাঁথা ছুঁড়ে মারল
আমরা গোল হয়ে দাঁড়ালাম—
কিন্তু পারলাম না।
আমাদের কুড়িয়ে আনা খড়কুটো শুকনোই রয়ে গেল,
ভেবেছিলাম জ্বালিয়ে তুলবই
কিন্তু পারি নি।

যে-সূর্যের গান গেয়ে গেয়ে গলা ছিঁড়েছ
সে-সূর্য এখনও জ্বলে ওঠেনি,
হঠাত্‌ রাত্রির অন্ধকারে তুমি নিভে গেলে।
দু একটি জোনাকির চিত্‌কারে
আকাশের দু একটি নিঃশব্দ তারায়
তোমার সংবিত্‌ ফিরে এল না;
তখনও ভোরের নীড়কে সূর্যের ওম এসে জড়িয়ে ধরেনি,
তখনও আকাশে অন্ধকার—
তোমার ছাড়পত্র এল।

কারার প্রার্থনা

আমাকে ভেঙে ফ্যাল, আমাকে মুক্তি দাও,
আমার এই লাল দেয়ালের নীলদাঁড়ায় হাতুড়ির ঘা মার,
আমার এই ইস্পাতফলকের পেশিতে কুঠার হান।
কে তোমরা বাইরে? কে তোমরা এদেশের মানুষ?
আমি জেলখানা—আমি ইংরেজের কারাগার --
আমাকে দয়া কর
আমার এই গরাদসত্তার অসহ্য অচলায়তন থেকে
আমাকে মুক্তি দাও।

দেখলাম, এল
শহরতলি থেকে কারখানার শ্রমিক
মাথায় ব্যান্‌ডেজ বাঁধা,
এল স্লোগান মুখে করে;
কার্বনের ক্রোধ তাদের ঠোঁট জুড়ে
বাটার, ট্রামের, অ্যালেনবেরির উত্তেজনায় তারা তেজোদৃপ্ত;
এল বাংলার ভাবিকাল
শৃংখল পরে।

দেখলাম, এল
শীতের সন্ধ্যায় ঠায় নগ্নদেহ
দ্বীপ-নদী-পরগনার সন্তানেরা
কোমরে দড়ি, লাঠিপাকানো হাতের কবজিতে হাতকড়া,

সামনে পেছনে প্রহরী
ভাবিকালের অজাতশত্রুরা এল,
চোখে মুখে আগুনের ঝলক
বুঝি বজ্রের ঝিলিক।

ও কে ?
চুপিসাড়ে মশাল জ্বালে ও কারা ?
গভীর রাত্রির বীভৎস প্রেতমূর্তিরা
ওরা কারা ?
দমবন্ধ অন্ধকারে
আতংকে ইঁটের পাঁজর আমার শিউরে ওঠে,
এখানে কে ও ?
এখানেও জতুগৃহ ?
প্রহরিবেষ্টিত আমি পাষাণ হয়ে চেয়ে দেখি :
বন্যায় হাঁপিয়ে ওঠা খালের জলের মতো
কলকল করে ওঠে ইয়ারডের বন্দিরা,
ফুলে ওঠে রাগে, ফুলে ওঠে ত্রাসে আতংকে,
ঘুম ফেলে লাফিয়ে ওঠে তারা
বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ ফলার মতো ;
দেয়াল পার হয়ে ছড়িয়ে পড়ে চীৎকার
কেঁপে ওঠে রাত্রির অন্ধকার
কেঁপে ওঠে জল্লাদের বুক।

শয়তান, তোমার লোভের বুঝি সীমা নেই,
ওকেও ধরে এনেছ এখানে ?
বাস্তুহারা মা-মরা মেয়েটাকেও রেহাই দেবে না ?

ছিন্নমূল মানুষ তাড়িয়ে নেওয়া তোমার ব্যবসা
দেশ থেকে দেশান্তর
এপার থেকে ওপার,
হন্যে কুকুরের মতো পিছু নিয়েছ ?
সৈরিন্ধ্রীর সম্মানেও বুঝি হাত দেবে ?

"খবরদার শয়তান !"··· ··
কে ও ?······
কিন্তু এখানে ক্যান ?
এই পাষাণপুরীর পাতালগহ্বরে
আলো হাওয়ার ত্রিসীমানার বাইরে
এখানে ক্যান ?
"খবরদার"······
কে ও ?···
"কেউটে সাপের বাচ্চা, তুমি শুনে রাখ
এ বিষ আমি ফিরিয়ে দেব তোমার কণ্ঠনালিতে,
মনে রেখ
এ দেশের বেহুলারা বিধবা হয়নি
তাদের ভেলা ভাসছে জালেমখুনের খালে,
ঝিলে জংগলে মাঠে জালেমি শিবিরের মাথায়
তাদের সঞ্জীবনমন্ত্র জ্বলছে দাউ দাউ :
শয়তান, চেয়ে দ্যাখ
তেলেংগানার লখিন্দর পাশ ফিরছে,
কৃষ্ণা গোদাবরীর দুই তীর দিয়ে
দপ দপ করছে তোমার সর্বনাশ।

এখানেও আমরা আজ
আমাদের ব্যান্‌ডেজ-বাঁধা হাত তুললাম—
শয়তান, নিপাত যাও।"

এ অবদমিত যন্ত্রণা আমার অসহ্য
ফেটে পড়ব ফেটে পড়ব আমি
চৌচির হয়ে যাব।
ইয়ারডে ইয়ারডে যমের কুকুর লেলিয়ে দিয়ে
অট্টহাসিতে ভেঙে পড়ছ ?
রাত্রির অন্ধকারে টুঁটি চেপে মারবার বীভৎস উল্লাসে
নেচে উঠছ ?
পিশাচ, পিশাচ।
এ নরক-যন্ত্রণার শেষ কবে ?
আমাকে ভেঙে ফ্যাল,
কে তোমরা এদেশের মানুষ ?
আমাকে দয়া কর।

বারুদে বারুদে বিস্ফোরক হয়ে উঠল দেশ—
এখানে উঁকিঝুঁকি, ওখানে হানা,
ঘরে ঘরে গ্রেপ্তারি পরোআনা,
গোয়েন্দা পংগপালের উত্‌পাতে নিরুত্‌সব আকাশ,
সংগিনের খোঁচায় গ্যাসে গোঙানিতে
অসহিষ্ণু মাঠ-দেশ, অধৈর্য কারখানা।
আর না।

পাগলাঘন্টিতে ঘা দ্যায় কারা ?
শিলং থেকে সালেম ছড়িয়ে পড়ে ঝড়ের সংকেত,

হিমালয়ের গুহা গম্‌গম্‌ করে ওঠে
বিন্ধ্যাগিরি থেকে পশ্চিমঘাট পর্বত
ফুঁসে গর্জে ওঠে রাগে।
আমি কারাগার
ভুখা হরতালের দাবানলে জ্বলে উঠি
জ্বলে ওঠে দেশ—অগ্নিগর্ভ জনতা ;
গরাদবন্ধ কুঠুরিতে বুকের পাঁজর ঠুকে
চকমকি ধরায় দধীচিরা,
ধরায় আজিজ, ধরায় মিহির,
আবির হয়ে ওঠে দিগ্‌দিগন্ত বৃত্রসংহারের মহড়ায়।
শুনি :
"আকাশ-কুন্তলা দেশ রৌদ্রস্নাত ভারতবর্ষ
কার ?
আমার।
বিপ্লবসরণি-বাঁধা মহাভারতের দীর্ঘ উত্তরাধিকার
কার ?
আমার।
তোমার সর্বনাশ আসন্ন শয়তান !
আমাকে তুষানলে দিয়েছ কতবার—
মরি নি।
আমাকে সংগিনে বিঁধেছ কতবার—
মরি নি।
বিষের বাটিতে চুমুক দিয়েছি—
মরি নি।

আমি মানব-সভ্যতার উত্তরসাধক
আমার মৃত্যু নেই।

আজ তুমি আবার সেই নেকড়েগুলোকে লেলিয়ে দিয়েছ
দেয়ালের গহ্বরে এখানে,
চাবুকে চাবুকে কালশিটে পড়িয়েছ পিঠে,
জল্লাদ পাঠিয়েছ বুকে হাঁটু দিতে ;
কিন্তু জেনে রাখ,
আমার আপাতমৃত্যুর দাম তোমার চূড়ান্ত সর্বনাশ।
এই নরহত্যার বীভৎস কারখানার দরজায়
ওই কিসের আঘাত ?
শোন, কিসের শব্দ ?
তোমার মৃত্যুর, আমার উত্থানের,
আমার পুনরুত্থানের দুন্দুভি।”…

শুনে শুনে বধির হয়ে যাব।
আমি মুক্তি চাই,
যদিও আমি গোলাম জেলখানা মাত্র
তবু অসহ্য,
অসহ্য এই অভিজ্ঞতা :
জাহান্নামের কালো আগুনের এই অন্ধকার থেকে
আমি মুক্তি চাই ;
কে তোমরা বাইরে ? কে তোমরা এদেশের মানুষ ?
আমাকে দয়া কর, আমাকে ভেঙে ফ্যাল,
এই গরাদ সত্তার অসহ্য অচলায়তন থেকে
আমাকে মুক্তি দাও।

ইচ্ছামতী

হে নদি, আবেগ-বন্যায় থরোথরো,
ভীরু ম্রিয়মান লজ্জাবতীকে কখনও কি মনে কর ?
একটু রোদের, আলোর, হাওয়ার ছোঁয়ায়, একটু গানে
দোলা লাগে যার প্রাণে,
তোমার দুধারে লতায় লতায় সবুজের জাল বোনা
কভু যার থামল না,
তার বাহু থেকে লজ্জা কে কাড়ে
ভয়ে-বোজা চোখ খোলায়,
কুণ্ঠাজড়িত স্বপ্ন চোখের ভোলায় ?
লজ্জাবতীকে তোমার তুফানে উত্তাল করে দোলাও
হে নদি, আপন বন্যায় থরোথরো
লজ্জাবতীকে তরংগময়ী কর।

তোমার গভীরে ঘূর্ণীর বীজ বাড়ে
ঘুমন্ত রাতে হঠাত্ তীব্র কশাঘাত লাগে পাড়ে,
সাজানো বাগান ধ্বসে খসে যায়, দ্বীপেরা হারায়,
প্লাবনে প্লাবন লাগে চারিদিকে—
সংঘাত এসে প্রহরে প্রহরে নিরিবিলি সুখ কাড়ে,
নদীর গোপন গভীরে ঘূর্ণী বাড়ে।

ইচ্ছামতীর গোস্পদে ওই স্বপ্নের ছায়া নামে—
পাখির ঝড়ের ঢেউয়ের ফুলের নীলের ওপার দেশের

পতাকায় রং নামবেই অবশেষে
নামবেই এই দেশে।
জাহাজ এল কি ?
গমভরা মাঠ ওমভরা মাটি নরম আখরে মোড়া
নীল নীল থাম, বিদ্যুত্ চোখ, লক্ষযোজন জোড়া
মুক্তির ঘ্রাণ, সোনালি সবুজ লাল হলুদের ম্যালা—
তাঁর ছোঁয়া এসে পৌঁছায় বুঝি আসন্ন ভোর ব্যালা।
নদীর গভীর ঢেউয়ের নূপুর পাখি হয়ে গ্যাল দূরে
রাত্রি নামল দিগ্‌দিগন্ত জুড়ে ;
অন্ধ গায়ক অ্যাকতারা নিয়ে রেল-লাইনের পাশে
পা ছড়িয়ে এসে বসল অ্যাকাই ঘন এলোমেলো ঘাসে,
মেঘে মেঘ লেগে তারা নিভে গ্যাল, কি যে জ্বালা তারে তারে;
নিরন্ন দেহ ভেঙে পড়ে গ্যাল তীব্র ক্ষুধার ভারে,
অ্যাকতারা ছিড়ে ছড়াল কান্না দেশজোড়া হাহাকারে।

আমি বারবার ইচ্ছামতীর রুপোলি ঢেউয়ের মতো
আকাশের চোখে ঝলকে ঝলকে খুশিকে দিয়েছি ছুঁড়ে
আমি বারবার মেঘে ভর দিয়ে উঠেছি আকাশ চূড়ে।
উল্কার রং প্রাণে দ্যায় দোলা, ঝড়ের চুমকি ঠাসা
রাত্রির মতো যৌবনে জ্বলে ঝিলমিল ভালবাসা,
ভোরের শিশির স্বচ্ছ আখরে ঘাসে যায় নাম লিখে
হলুদ শরত্-গন্ধ ছড়ায় শেফালি দিগ্‌বিদিকে,
ইছামতী-জলে মধু ভরে ওঠে, মধু ভরে ধানশিষে—
এ প্রাণবন্যা রুখবে পৃথিবী কিসে ?
হে নদি, ঢেউয়ের বন্যায় থরো থরো
হে আমার মিতা, তোমার চূড়ায় আমাকেও তুলে ধর।

আদিম বন্য জলধারা, তুমি তুষার মুকুট খুলে
নেমে এস এই ঝর্‌নার পথে ; আমার মর্মমূলে
সূর্যমুখীর সোনালি পরাগ অজস্র হাতে ছড়াও
গুহার অন্ধ দেয়ালকে ভেঙে পলিমাটি মাঠ গড়াও।
তরংগে ভেঙে আমার মনের লৌহকবাট খোল
মাটি থেকে টেনে আমাকে তোমার মত্ত চূড়ায় তোল।
আমি পৃথিবীর প্রথম তৃষ্ণা, আমার জীবন-ভোরে
বিন্দু বিন্দু বৃষ্টির মতো রক্ত পড়েছে ঝরে ;
সে-রক্তরেখা পদ্মের বনে, গোলাপের গুঞ্জনে,
সে-রক্তরেখা ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ, ক্ষতবিক্ষত মনে ;
সে-রক্তরেখা সাতান্ন সাল, সে-রক্তধারা বোম্বাই বিদ্রোহ,
সে-রক্ত আজ ফুটন্ত রোষে বেদনায় দুঃসহ।
আমার রক্তে দিগন্ত রাঙা, আমার রক্তে আগ্নেয়গিরি জ্বলে
আমার রক্তধারায় মুক্তি আনবে স্বদেশ মুক্ত আকাশ তলে।
হে নদি, আবেগ-বন্যায় থরো থরো
তোমার ঢেউয়ের উত্তাল চূড়ে আমাকেও তুলে ধর।

ব্যারিকেডের কাব্য

মৃত্যু-নিথর খুনি অক্ষরে লক্ষ বেদনা কাঁপে
বারুদগন্ধি ক্ষুব্ধ ঘৃণায় অস্থির সন্তাপে,
খুন-খারাপি এ-কাব্যে আমার কথার ফলকে শত প্রতিবাদ কাঁপে।

লালদিঘিচূড়ে শারশির কাচ খসে খসে পড়ে
ফেবরুয়ারির নভেমবরের ঝড়ে !

নীল মালাবার পাহাড়শৃংগে দপ করে জ্বলে উঠে
ক্রুদ্ধ থাবার আঘাতে ও কারা লোটে ?
ও কারা ত্রিবাংকুরে
দেওয়ানি আইন ছিঁড়ে ফেলে দ্যায় দাক্ষিণাত্য জুড়ে,
দর্পি-জুলুমে জাগে দাউ দাউ তুহিনাভ কাশ্মীরে ?
তেলেংগানার মাঠে মাঠে গ্রামে বন্দরে বন্দরে
মৃত্যুঞ্জয়চিত্ত ও কারা মরে বেঁচে উঠে অসংখ্যবার মরে ?

মনে কর, আরও তিন শতাব্দী পরে
ভারতবর্ষে ঝড় থেমে গেছে, কচি কচি ফুল
সবুজ জমিনে ফুটে আছে থরে থরে
ঝড়-উত্তীর্ণ তিন শতাব্দী পরে।

স্নেহ-সুগহন অপরাহ্নিক কমলা রঙের রোদ
খানিক পড়েছে হাওয়া-ঝন্‌ঝন্‌ গুচ্ছ ধানের শিষে,
খানিক পড়েছে শহরের কারনিশে,
সন্ধ্যাপ্রহর কিছু মায়া তার ছড়িয়েছে ফাল্গুনে
বাকি আরও কিছু আগামিকালের অংকুরে অংকুরে
নিভৃতে গিয়েছে বুনে।

শূন্য ব্যারাকে বাজে কনসার্ট দেউলে লক্ষ বিদ্যুত্‌বাতি জ্বালা,
সেখানে বসেছে পাথর উপড়ে
নয়া জমানার নতুন গ্রন্থশালা,
শ্বেতপাথরের টেবিলে তরুণ আগ্রহিমন ইতিহাস খুলে পড়ে—
তিনশ বছর আগেকার কোন্‌ রক্তসালের কথা
বুকে তার নড়ে চড়ে ?

সে কোন্ পৃথিবী খুনে খুনে লাল বিপ্লবে থরো থরো
আওয়াজ-মুখর ময়দানে যেথা পতাকার নিচে মানুষেরা হয় জড়ো ?
সে কোন্ পৃথিবী মূক মানুষের মুষ্টি উচানো দেখে
মৃত্যু ছড়ায় লাঠি বেঅনেটে ক্রুর রাইফেল দেগে ?
কিশোর রক্ত ছাপ লেপে দ্যায় সন্ধ্যারক্তরাগে
তিন শতাব্দী আগে ?

বন্ধু, তোমার বুলেটবিদ্ধ হৃৎপিণ্ডের কথা
কান পেতে ওরা শুনেছে, শুনবে, রেণু রেণু লাল অভূতপূর্ব্ব ব্যথা।
ব্যর্থ হয়নি বিদ্রোহীপ্রাণ, ব্যর্থ হয়নি জ্বলে ওঠা রাতগুলি,
ব্যর্থ হয়নি বেঅনেটঘায়ে উড়ে-যাওয়া কচি খুলি,
সেই দাবদাহে মরা সূর্যের চরে
জীবন জেগেছে উত্তেজনার জ্বরে
অন্ধকুটিল রাত্রি ছিঁড়েছে শত উল্কার ঝড়ে।
বন্ধু, তোমার রক্তের ছিটা সূর্যের চোখে লাগে
তিন শতাব্দী সামনে এবং তিন শতাব্দী আগে
প্রত্যূষে আর সন্ধ্যারক্তরাগে।
বছর বছর ক্রেনে উঠে নেমে খনিগহ্বরে খেটে
যারা অ্যাতকাল অন্ন পায়নি পেটে
তাদের প্রাণের গুহায় লুকানো ডিনামাইটের ঘৃণা
দিয়ে যাবে দক্ষিণা,
তাদের কণ্ঠে ভুরুকোঁচকানো ভাষা
তাদের আকাশে ক্ষত বিক্ষত রামধনু-আঁকা আশা
তাদের পেশিতে দাগ কেটে দিল তোমার পেশির বুলেটবিদ্ধ ভাষা।

নীল তাঁবু ফেলে প্রজাপতিরাত যাপন করছে কারা ?
ওরা কি শোনেনি মাঠ মাঠ জুড়ে মাটির ঢ্যালায় লক্ষ পায়ের সাড়া ?

ওরা কি দ্যাখেনি চিত্‌কারভাঙা বহ্নি-আকাশ জুড়ে
স্নেহ-সুনিবিড় বাঁধা নীড় গ্যাছে পুড়ে ?
ওদের বেহালা প্রলয়ংকর প্রহরে যায় না থেমে
ওদের স্বপ্ন আগুনে ওঠে না ঘেমে
নিরাপদ প্রাণ সিন্দুকে পুরে ওরা শৌখিন গুন্‌ গুন্‌ সুর ভাঁজে
ভূমিকম্পেরও মাঝে।

আমার কাব্য ক্রোধে ফেটে-পড়া আগুন-পাহাড়
আমার কাব্য মহাসমুদ্র গলিত লাভার ;
টুঁটি-চেপে-ধরা বোম্বেটেদের সবংশ নাশ
আমার কাব্য দ্যায় যেন তারই কঠিন আভাস।

এই মরা দেশ জাগছে আবার জাগছে আবার,
আকাশপ্রান্তে গুঞ্জন ওড়ে অনেক পাখার অনেক পাখার,
এই মহাদেশ জাগছে আবার !
আমাদের বুক ছিঁড়ে দিয়ে যাব নতুন কালের হাতে
বুলেটাকীর্ণ ব্যথা-ধুকধুক অরুণচিহ্ন বুক
নিঃশেষ করে ঢেলে দেব সবটুক।

বন্ধুরা এস ব্যারিকেডে বসে তাড়াই আঁধার
দুর্গচূড়ার ঊর্ধ্বে জ্বলুক তারকার সার,
বারুদগন্ধি সংগিনে রচি কাব্য আমার
ক্রোধে ফেটে পড়া বুলেটবিদ্ধ আগুন-পাহাড়
দাউ দাউ জ্বলা মহাসমুদ্র গলিত লাভার।

যৌবন

আমার জীবনে তোমার আবির্ভাব
একটি তরংগ-উত্তাল সমুদ্র-ঝড়ের মতো।
তুমি আমাকে অধিকার দিয়েছ মাটির, ঘাসের, ফসলের, ফুলের
পৃথিবীকে আমার জানলার পাশে টেনে এনে বলেছ—
এই তোমার সুহৃদ ;
ভালবাসার বাসরে আমায় অ্যাক জোড়া স্নিগ্ধ
মোমবাতির মতো চোখ উপহার দিয়ে বলেছ—
এই তোমার স্বর্গ ;
আমাকে তুমি নরকের গভীর থেকে ইন্দ্রপুরীর চূড়া পর্যন্ত
অবাধ ছাড়পত্র দিয়েছ ;
যৌবন, আমি তোমার কাছে ঋণী।

ঝড়ের কেশর থেকে একটি সোনালি বিদ্যুত্‌ তুলে নিয়ে
আমি য্যান কার হাতে জড়িয়েছি,
রাত্রির ছায়াপথ থেকে তারা তুলে নিয়ে
রচনা করেছি আর‍্যাক ছায়াপথ।

আমার তৃষ্ণা ছিল ঝড়ের
সে-ঝড় ওঠে নি, তাই আমি অতৃপ্ত ;
আমার অভিমান ছিল বিদ্যুতের
সে-বিদ্যুত্‌ এখনও মেঘে, তাই আমি অভিমানী ;
আমার আকাংক্ষা ছিল সমুদ্রের
সে-সমুদ্র আজও কূপমণ্ডুক, তাই আমি ক্ষুব্ধ।

আমি চেয়েছি জীবনের বিস্তারকে মেলে দেব
পতাকা-রঙিন শোভাযাত্রার মতো,
বেঁধে দেব মনকে—মনের দিগন্তপ্রসারি আশা-
আকাংক্ষা-বাসনাসাধকে-
একটি অব্যর্থ বিদ্রোহের সাথে।

আমার হৃত্‌পিণ্ডের অন্ধ গহ্বর
ভারতবর্ষের বিরাট হৃত্‌পিণ্ডে ভরে উঠেছে ;
এই উপবাসক্ষীণ অ্যাতটুকু বুকে
অ্যাত বড় প্রসর সৃষ্টি করল কে ? সে কি তুমি ?
মুক্তির মরীচিকার সামনে এই নিপীড়ন—আমার স্বদেশ,
এই বেদনা, ক্ষোভ, আক্রোশ—আমার অহংকার,
তাই আমার হৃদয় আজ আগুনের পাহাড়
ভারতবর্ষের হৃদয়ের মতো।

যৌবন,
তুমি কি জান নদীতে ঢেউ ওঠে ?
তুমি কি জান সেই ঢেউ পিঠে নিয়ে
কলকণ্ঠ জোয়ার তার ঘোড়া ছোটায় ?

তুমি কি জান পাহাড় শুধু পাষাণ নয়,
সে একটি দুর্দান্ত বারুদ যার নাম আগ্নেয়গিরি ?
যৌবন,
শুনেছি তোমার আকাশে ভর দিয়ে মানুষ মেঘদূত হয়েছে,
গিরিকান্তারমরু ডিঙিয়ে ব্যাংগমা পাখির দেশে
শূন্যকে পক্ষিরাজ করে সে ছুটেছে,—
সে কি কাহিনী ?

কাশের গুচ্ছে বাঁধা তুমি অ্যাক শরতের অফুরন্ত আকাশ,
তোমার তীব্র স্নিগ্ধতায় ধুইয়ে দিয়েছ আমাকে,
আমাকে পবিত্র করেছ,
লজ্জার, ভয়ের, শিহরণের কাঁটার ওপর
কখন্ একটি নিষ্পাপ গোলাপ ফুটে উঠেছে,
কখন্ য্যান কুয়াশার খড়খড়ি তুলে
অ্যাকঝাঁক রোদ এসে পালক ছড়িয়ে গ্যাছে ঘরে ;
যৌবন, তুমি আমাকে জীবন দিয়েছ।
আমি ছিলাম বনের জোনাকি
আমার নিভৃত আগুনে ছিল গুঞ্জন,
তাকে তুমি করেছ গান, করেছ ধ্রুবতারা,
তাকে পাঠিয়েছ আকাশের চূড়ায়, দিয়েছ দীপ্তি
যা আদর্শের মতো স্থির, প্রত্যয়ের মতো উজ্জ্বল।

আমি দামোদরের বাঁধ দিয়ে হেঁটে গ্যাছি,
এক হাঁটু কাদায় ভেঙেছি বর্ষার মাঠ—আবেগে,
যেখানে কৃষক জমির দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে,
বলেছে, 'কবে পাব ?'
শালতির জল ছেঁচে ডিঙিয়েছি খাল,
এসেছি ইছামতীর কানায় কানায় ভরা তীরে
যেখানে শিক্ষক গলায় দড়ি দিয়েছে ;
যৌবন, তুমি সেই অতলস্পর্শ অমাবস্যায়
লণ্ঠন ধরে ধরে আমায় পথ দেখিয়েছ।

যে-ছেলেটা ভুল বকে বকে মরে গ্যাল
সে তো কোনদিনই আর তোমাকে পেল না।

যে-কিশোর হায়দরাবাদের জেলে নিখোঁজ হয়ে গ্যাল
তাকে আর ক্যামন করে ছোঁয়াবে তোমার জাদু ?
কুচবিহারের সেই অদ্ভুত মেয়েটির অবাক কাজল চোখে
তুমি একটি সোনার হরিণ উপহার দিতে চেয়েছিলে,
আহা, শেষবারের মতো যখন সে চোখ মেল্‌ল
তখন ভুরুতে তার পোড়া পোড়া বারুদগন্ধ, কি বিকট !
আর রানাঘাটের সেই কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় ছাউনিতে
তোমার বসন্তস্পর্শের বদলে শুধু শব আর শেয়াল—
বাস্তুহারার বিদীর্ণ যৌবন।

আঙুলের ডগায় ঝড় তুলে মুগ্ধ শিল্পীর মতো
অ্যাক অনবদ্য সেতারকে তুমি মাতিয়ে রেখেছ—
সে-সেতার আমার জীবন ;
সুর তুলেছ বিদ্রোহের, বিদ্যুতের, বন্যার—
সে অ্যাক অপূর্ব সম্মোহন।
হে যৌবন, হে জাদুকর, হে আমার নেতা,
জীবনের উজ্জ্বল মিলিত শোভাযাত্রার সংগে আমাকে মেলাও
যে-শোভাযাত্রার শুরু নেই,
শেষ নেই।

আমার তৃষ্ণা ঝড়ের,
সে-ঝড় ওঠে নি, তাই আমি অতৃপ্ত ;
আমার অভিমান বিদ্যুতের,
সে-বিদ্যুত্‌ এখনও মেঘে, তাই আমি অভিমানী ;
আমার আকাংক্ষা সমুদ্রের,
সে-সমুদ্র আজও কূপমণ্ডূক, তাই আমি ক্ষুব্ধ।

পার্ক স্ট্রিটের স্ট্যাচু

পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে কে য্যান ডাকল
আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম : "কোথায় যাচ্ছ ?"
কিন্তু কাউকে দেখলাম না।

খুব জোরে ব্রেক কষলাম,
জুতোটা একটু ঘষলাম ক্লাচের ওপর—
না, কোথাও কেউ নেই।
আয়নার ভেতর পেছনে শেকসপিঅর সরণি পর্যন্ত
পিচের রেখা ছাড়া কিচ্ছু নেই।
কিন্তু সিট ছেড়ে নেমে এলাম না,
আবার ধীরে ধীরে গিআর চড়ালাম।
কাউকে দেখলাম না,
শুধু নিজেকে জিজ্ঞাসা করলাম : "কোথায় যাচ্ছি ?"

জাদুঘরের সামনে কি য্যান অসাড়
রাস্তা রোধ করে পড়ে আছে।
আবার খুব জোরে ব্রেক কষলাম, পাছে—
না, তা নয়, দেওদারের দীর্ঘ ছায়া।
আবার য্যান কে ডাকল,
আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম : "কোথায় যাচ্ছ ?"

এবার স্পিড বাড়ালাম
যতক্ষণ না অপস্রিয়মাণ দুধার
ঝাপসা হতে হতে একেবারে ঘষা কাচ হয়ে গ্যাল।
তারপর সেই ডাক আমায় তাড়িয়ে নিয়ে ব্যাড়াল সারাদিন
পার্ক স্ট্রিট থেকে স্ট্র্যাণ্ড, স্ট্র্যাণ্ড থেকে বজবজ,

আবার স্ট্র্যাণ্ড, আবার এস্প্ল্যানেড, আবার জাদুঘর,
আবার খুব জোরে ব্রেক কষলাম।
কে যেন ডাকল।
"কে ?" নিজের মনেই চিত্কার করে উঠলাম।
কেউ না।
স্টার্ট দিতে যাব অ্যামন সময় দেখি—
এক বৃদ্ধ, খালি পা, হাতে একটা লাঠি,
ঠিক পার্ক স্ট্রিটের মাথায় স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে।

তারপর সারা বাংলাদেশ, সারা ভারতবর্ষ,
নোয়াখালি থেকে সবরমতী,
গাড়িতে, ট্রেনে, এরোপ্লেনে ছুটে বেড়িয়েছি,
আর ঐ স্ট্যাচুর মতো লোকটা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে
আমার স্পিডোমিটারকে লজ্জা দিয়েছে,
তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে পথ থেকে পথে
পার্ক স্ট্রিট থেকে, বজবজ থেকে, কলকাতা থেকে, দিল্লি থেকে,
কাজে, অকাজে ন্যায়-অন্যায়-নিয়ম-অনিয়মের
এবড়োখেবড়ো পথে
ছুটতে ছুটতে কেবলই শুনছি : "কোথায় যাচ্ছ ?"
আর কেবলই ব্রেক কষছি।

সেই বৃদ্ধ, খালি পা, হাতে অ্যাকটা লাঠি,
সর্বত্র স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে।

সত্যিই, কোথায় যাচ্ছি ?

সরলরেখার জন্য

সামান্য অ্যাকটা সরলরেখার জন্য মাথা খুঁড়ছি,
পাচ্ছি না।
পৃথিবীতে কোথাও অ্যাকটা সরলরেখা নেই।

আকাশ অপরাজিতা-নীল, কিন্তু গোলাকার,
দিগন্তও চক্রনেমিক্রম,
নদী আঁকাবাঁকা, পাহাড় এবড়োখেবড়ো,
হ্রদ চ্যাপ্টা, উপকূল বুকে-হাঁটা সরীসৃপের মতো খাঁজকাটা,
কুকুরের ল্যাজ কুণ্ডলী, হরিণের শিং ঝাঁকড়া,
গোরুর খুর দ্বিধা, আর গ্র্যাণ্ডট্রাংকরোড উধাও কিন্তু
এলোমেলো।
সৃষ্টিতে সরলরেখা বোধ হয় অ্যাখনও জন্মায়নি।
যত দাগ সব হয় ডিম, নয় নারকেল, নয় কলার মোচা—
বৃত্ত, উপবৃত্ত, ইত্যাদি ;
অ্যাকটাও সোজা নয়।

কোন মানুষই সোজা নয়,
তাই বোঝা শক্ত।

মাথার ওপর সূর্য—জবাকুসুম—
তিনিও সোজা চলেন না,
উত্তরায়ণ থেকে দক্ষিণায়ন
মাতালের মতো টলছেন।

সোজা কিছুই চোখে পড়ছে না।

তোমার চোখের ঈষৎ-ভাষাও
আমার বুকের মধ্যে এসে ক্যামন য্যান বেঁকে যাচ্ছে,

আর আমার সোজা ইচ্ছাটাও তোমার দ্বিধার মধ্যে
কেবলই কৌণিক।

সামান্য অ্যাকটা সরলরেখার জন্য
আমরা বসে আছি।

আমিও যন্ত্রণাকে

যন্ত্রণা যখন আমাকে মোচড়ায়
আমি বিক্ষত পরাহত ম্যাটাডোর
উদ্ধত শিঙের নিচে হতমান।

তখন পিপাসু বাহুর মধ্যে একমাত্র পরী
পিপাসা,
এবং চুম্বন আমার ওষ্ঠের প্রতি বিমুখ।

গলার মধ্যে ঠেলে-ওঠা কান্না ঠ্যাকাতে পারি না
নিজেকে ক্যামন বিসদৃশ ঠ্যাকে ;
তখন আলিংগনের চূড়াগুলি ভগ্ন দেউল
যখন যন্ত্রণা আমাকে মোচড়ায়
এবং আমি বিক্ষত পরাহত।

যখন যন্ত্রণা আমাকে মোচড়ায়
বুকের মধ্যে সমুদ্রতীরে স্বাক্ষরিত ফটো
কেবলই দুমড়ে যেতে থাকে।

তখন দিগন্তবিস্তৃত রেললাইন
য্যান সমান্তরাল বিদ্রূপ
এবং উতল জংশন সূর্যাস্তের ওপারে।
কেশশ্রী-সন্ধ্যার নিচে ঘোরানো আকাশ-সিঁড়ি
ছাদ ছাড়িয়ে আরও কতদূর কে জানে ?
মাত্র চারটি অক্ষরের মধ্যে
আমার সব স্বপ্ন তখন বন্দী,
যখন যন্ত্রণা আমাকে মোচড়ায়
এবং আমি বিক্ষত পরাহত।

কিন্তু যন্ত্রণাকে আমি যখন মোচড়াই
তখন কাছের আগুনেই দুহাত সেঁকি
এবং আগুনের ফুলকিতে ফুল ফোটাই।
মনোহর দূরত্বে আমি তখন বড় হয়ে উঠি,
আমার যন্ত্রণার কালশিটের ওপর
আনারকলি-ছোঁয়া টুং-টাং বাজে।

বঞ্চনাকে বড় সুন্দর লাগে
য্যান কপোল-কল্পনার সহচরী,
তখন অতিথি-চোখের ভরপুর বিরহ
যন্ত্রণার সঙ্গে যন্ত্রণার সংগম ঘটায়।

যন্ত্রণা আমাকে মোচড়ায়
এবং আমিও যন্ত্রণাকে মোচড়াই।

‘ময়না-পড়ো’ পিসিমা

‘ময়না-পড়ো’-পিসিমা, তুমি অ্যাখন কোথায় ?
কোথায় তোমার নদীচ্ছবি মুখ, শীতলপাটি-স্নিগ্ধ শরীর,
তোমার কবুতর-চোখের মধ্যে শায়িত
আমার প্রথম উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি ?

বিশেষণ-খোঁজা আমার প্রথম ফাউনটেন পেন তোমারই দেওয়া,
এবং ফেনিলোচ্ছল সমুদ্রতীর থেকে কুড়িয়ে আনা অ্যাক ঠুঁটো নাম !
তোমার দুধে-আলতা পায়ের তলায়, দ্যাখ,
রিমঝিম ভাদ্রে আমি হাপুসনয়ন
এখনও শিশু—বসে আছি।

‘ময়না-পড়ো’-পিসিমা, তুমি অ্যাখন কোথায় ?
হরবোলা বোষ্টমকে বারান্দায় বসিয়ে কতকাল
গান গাওয়াও না !

নবগংগা নদীর জলে কত মাছ কত স্নেহ
কতকাল সেখানে স্নান করিনি, সাঁতার দিইনি, হাজরাপুরের
নীলকুঠিতে যেতে লিচুফলের লাল টকটকে খোসা কতদিন
ছাড়াইনি,
কতকাল সাইকেলে চড়ে শ্মশান পেরোইনি, সিদ্ধেশ্বরী মঠে
কৃষ্ণা চতুর্দশীর ঘণ্টা শুনিনি,
ডাকের-সাজ আশ্বিনে ‘যা-দেবী-সর্বভূতেষু’ মণ্ডপে ভিড় করিনি !

তোমার অন্নদামংগল-পদাবলি-কালিদাসগ্রন্থাবলির মধ্যে
কীটের মতো অ্যাকদিন প্রবেশ করতে দিয়েছিলে,
তোমার গীতগোবিন্দের পাতা কপি করতে দুপুর গড়িয়ে যেত,
তুমি আবৃত্তি করতে,
তোমার কণ্ঠের আশ্চর্য সব লাইনগুলি এখনও আমার কণ্ঠে।
বাবুই পাখির বাসার মতো তোমার কুলুংগিতে আরো কত সব
পুথির খড়কুটো ছড়ানো থাকত
প্রাচীন অযোধ্যা দ্বারকার গন্ধে ভরপুর ;
প্রকাণ্ড সংস্কৃত মহাভারত য্যান কুঠুরির মধ্যে এক মহীরুহ,
এবং তার পাশে সোনার জলে বাঁধানো
দুর্গেশনন্দিনী কপালকুণ্ডলা, কৃষ্ণকান্তের উইল—
ইহকাল ও পরকাল !

রাঙা পিসিমা, তুমি অ্যাখন কোথায় ?
অ্যাখন বড় হয়ে জানতে ইচ্ছে করে, তোমার রক্তে কোন সংগ্রাম,
চোখের পল্লবের নিচে কোন অগ্ন্যুৎপাত কখনও ছিল কি না,
তোমার ঈশ্বরীর মতো আর্দ্র মুখ, শিউলি-গন্ধি নিটোল হাসি,
তোমার দুর্ভেদ্য সৌন্দর্য—কি জন্মগত, না দমিত কান্নার জন্মান্তর ?

গ্রীষ্মের ছায়াতৃষ্ণ দুপুরে পশ্চিমের কোঠায় শুয়ে
তুমি পাতার পর পাতা আমার উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি দেখেছ,
সদ্য-উদ্‌গত কথাগুলি ওজন করে করে পড়েছ,
অবিশ্বাস্য আকাশে কত অসম্ভবের ঘুড়ি উড়িয়েছি—
তুমি বন্ধুর মতো সাহস দিয়েছ, সুতো ছেড়েছ, প্রশ্রয় দিয়েছ,
আমার স্বপ্নসম্ভব চিত্রাল ঘুড়িটাও য্যান তোমারই।

তোমার দেওয়া ফাউনটেন পেন, মসৃণ খাতা, এবং
অসংখ্য ঝিঁঝিঁপোকার স্বর—রক্তের স্রোতোলিপি—
সৃষ্টির মধ্যে অজস্রানোর প্রথম সুস্পষ্ট সুপারিশ!
'ময়না-পড়ো'-পিসিমা,
তোমার দিনান্তশ্রী মুখ আমি এখনও দেখতে পাই।
আমার স্বপ্নের মধ্যে তোমার অফুরন্ত শরত্‌, অগণিত স্থলপদ্মের পাঁপড়ি;
তোমার চোখের জলছবি এখনও আমার চোখে।

তোমার খই-শাদা শাড়িতে আমার শৈশবের নামতা বেঁধে রেখেছিলে অ্যাকদিন।
কিন্তু তুমি জানতে, সময় অ্যাকদিন আমার দেহমনকে অতিশয়াবে,
ঢিলের মতো দূরে ছুঁড়ে দেবে আমার মাছরাঙা শৈশব,
আনবে কোকিলের ঋতু, যখন কবিতার মধ্যে আমি
নতুন করে অংকুরিত হব, স্বপ্ন দেখব, এবং আমার স্বপ্নেরা
বুকের মধ্যে অপরাজিতার মতো ফুটবে। তুমি জানতে,
কল্পনায় জলাক্ত মাঠ রৌদ্রানোর এবং চেনা মুখ
প্রতিমার মতো কল্কানোর সেই ঋতু
আমায় বুক থেকে বুকে আছাড় খাওয়াবে।

'ময়না-পড়ো'-পিসিমা, তোমার জন্য শোক; সান্ত্বনা কিছুই খুঁজিনি।
কে কাকে হারিয়েছে, কে কাকে হারায়, বল ?
ইতিমধ্যে যা গিয়েছে তা অনেকগুলি উত্তর ও দক্ষিণায়ন,
কিছু রাত-উষানোর রোদ, কিছু কিছু অপরাহ্ণিক অবসাদ,
কয়েক ঝাঁক বুনো হাঁস, অয়শ্চক্রনিভ দিগন্তে সূর্য-অস্তানোর
আরক্ত কলরব—

শব্দ নিঃশব্দ, শব্দ নিঃশব্দ, শব্দ,
এবং তোমার 'প্রিয়ন্তে-সর্বদেবতাঃ' কণ্ঠস্বর।

'ময়না-পড়ো'-পিসিমা, তুমি অ্যাখন কোথায় ?
তুমি কি জান, তোমার অনাবশ্যক ময়নাটি আমি মেরে ফেলেছি ?
অবশ্য কেউ সনাক্ত করতে আসেনি এবং আকাশের রক্তাক্ত রোদ
তাতে একটুও নিষ্প্রভ হয়নি।
কে কাকে হারিয়েছে, বল, কে কাকে হারায় ?
শুধু কয়েকটি রাত-উষানোর প্রহর এবং সূর্য-অস্তানোর
'ওরে-বিহংগ' সন্ধ্যা,

এবং আমার বুকভাঙা
রাঙা পিসিমা, রাঙা পিসিমা, রাঙা পিসিমা।

তোমার মুখ আমি

তোমার মুখ আমি কখনও দেখতে পাব না,
কিন্তু তুমি আমার মুখের ওপর ঝুঁকে চেয়ে দেখবে—
প্লাস্টার-অব-প্যারিসে মুদিত নিঃসাড়, চোখের শাটার বন্ধ,
কয়েক কুড়ি বৎসরের রোদবৃষ্টির দাগ-লাগা।

বারান্দার ইজিচেয়ারটিতে নতুন কাপড় লাগাবার দরকার হবে,
কিন্তু কোন অ্যাক বিশেষ রঙের কাপড়ের জন্য পীড়াপীড়ি থাকবেনা,
বই পড়ে থাকবে ছড়ানো, মুড়ে রাখা পাতা মুড়ানোই থাকবে.
অসম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ,
আমি খুলে দেখব না, দেখতে পারব না।

তোমার মুখ আমি কখনও দেখতে পাবনা.
কিন্তু তুমি আমার চোখের জমাট কুয়াশার ওপর
ঝুঁকে চেয়ে দেখবে—
আমার গলার সব স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনি তখন মধ্যরাত,
বাঁ হাতের আঙুলে বেহালার তারের জন্য কোনো আকাংক্ষা নেই,
শুধু পুরোনো কবিতার অনেক মুখস্থ লাইন কুয়াশার মধ্যে ডুবে।

রোদ শুয়ে থাকবে ছাদে, কলের জল ছলছল করে উঠবে,
কলিংবেলের ওপর মাকড়শা জাল বুনবে—
তোমার মুখ আমি কিছুতেই মনে করতে পারবনা।

ঋতুবদল

য্যামন আছে তেমনি থাকবে ?
যে-ফুলদানি যেখানে
সেখানেই ?
না—না।

আবরু যেটা ছেঁড়া সেটা
থাকবে ছেঁড়াই ?
না—না।

অবিশ্বাসে এমনি কাটবে
এ-ব্যালাটা ?
এমনি থাকবে অসম্পূর্ণ
এ-খ্যালাটা ?
রাজা, মন্ত্রী, ঘোড়ার আড়াই
যেমনি আছে তেমনি থাকবে
খ্যালা চলবে বোড়ে ছাড়াই ?
না—না।

য্যামন আছে তেমনি থাকবে ?
যে-ভূগোলটা যেখানে
সেখানেই ?
না—না।
য্যামন নদী জল-শুকনো,
রোদ-পোড়া দেশ
যেমনি,
তেমনি ?
না—না।

বুকের মধ্যে য্যামন দুঃখ
মুখের ভাবনা যেখানে,
সেখানেই ?

য্যামন রুক্ষ তেমনি থাকবে
মাঠটা ?
উদয়-অস্ত ‘হচ্ছে-হবে’র
প্রাণান্তকর ঠাট্টা
চলবে এমনি ?
না—না।

যেমনি রাজা তেমনি প্রজা
যে-ফুলদানি যেখানে
সেখানেই ?
না—না।

দেবদারু ও কৃষ্ণচূড়ার শোকে

কুঠারে কুঠারে ছিন্ন, আমি আজ অফিসে যাব না ;
রক্তাক্ত কাষ্ঠের খণ্ড আমি আজ,
আমি আজ সুস্থ নেই, আমি আজ অফিসে যাব না।

ডোভার লেনের মাঠ পার হতে গিয়ে
বাকশূন্য পংগু হয়ে গেছি।
যে-মাঠে সন্ধ্যার তারা দেখেছি অনেক
এ-মুহূর্তে সেই মাঠ নিতান্ত অনাথ—
ছড়ানো বৃক্ষের শাখা, কাটা ধড়, শুশ্রূষাবিহীন।
অনাথ আমিও, য্যান

ছিন্ন অঙ্গ-প্রত্যংগের আদিম শরিক।
দেবদারু কৃষ্ণচূড়া শুয়ে আছে স্তূপীকৃত শব—
আমি আজ কোন্ মুখে যাব ?

'পরশুরামেরা যাও, ফিরে যাও।'   বৃথা বলা।
কে শুনেছে ?   কে ফিরেছে ?
দয়াহীন আততায়ী
বিবেকের শেষ দংষ্ট্রা কেটেছে করাতে।

মৃত দেবদারুটির অন্তিম যন্ত্রণা
আমার আত্মার মধ্যে শুয়ে আছে
অশরীরী অব্যক্ত অবোধ ;
আমার হৃত্‌পিণ্ড-মূল বিদীর্ণ ফলকে।
কৃষ্ণচূড়া শবটিকে নিয়ে গ্যাল বিশাল লরিতে
রক্তের দর্পের মধ্যে অন্তিম শায়িত।
তার আত্মা আমার আত্মার মধ্যে,
তার শেষ শীর্ণ মুখ আমার মুখের নিচে
বসে গ্যাছে ছাঁচের মতন।

দুঃস্থ আমি, নিতান্ত অসুখী আমি,
আমি আজ অফিসে যাব না।

অন্য কারা যেন

অন্য কারা যেন, কি-করে, আমাদের আগেভাগে এই উপত্যকায়
এসে গ্যাছে,
প্রত্যেককে নাম ধরে ধরে ডেকে গ্যাছে,
এই জলকে বলেছে নদী, ঐ জলকে বলেছে হ্রদ, এবং
সেই টুপুর-টাপুর আকাশ-ঝাঁঝরি জলকে বলেছে বৃষ্টি ;
আগুনের হলকার মতো মাঠ-তাপানো রক্তফুলকে বলেছে কৃষ্ণচূড়া,
ময়ূর-পাখা আকাশকে নতুন বিশেষণে নীলাবো তার উপায় রাখেনি,
রামধনুর সাতটি রঙের ওপর সাতটি নামের তেলরঙ লাগিয়ে
রেখে গ্যাছে।
নামে নামে রূপবান তাই আমাদের সংসার,
রূপবতী আমাদের পুষ্করিণী, আমাদের পূর্ণিমা এবং সর্পগন্ধা রাত্রি।

কারা য্যান গ্রীষ্মের ছুটি কাটিয়ে গ্যাছে এখানে অনেক অনেকদিন
আগে ;
তাদের চড়ুইভাতির উনুন পড়ে আছে এই গাছের ছায়ায়,
প্রাচীন মশলার ঘ্রাণ ছড়িয়ে রয়েছে দেবদারুর ত্বকে,
শুকনো পাতাগুলি হাওয়ায় এলোমেলো, য্যান আদিমকালের
ডায়েরির ছেঁড়া পাতা।
টিলার ওপর পড়ে আছে দিগন্ত-সাক্ষী প্রতিশ্রুতি
জল বাতাস বিদ্যুতে যার প্রতিশব্দ নেই।
অনেক দ্যাখাশোনাহীন শতাব্দী চলে গেছে
দেওয়া-নেওয়া-হীন হৃদয় অতিক্রম করে,

তারপর আমরা এসেছি এই ব্যাঙের-ছাতা-ছাওয়া বটপাকুড়ের
মাঠে আজ,
টিফিন-কেরিয়ারে বয়ে এনেছি সাঁতলানো মাংস,
গরম মশলানোর জন্য দারচিনি, লবংগ, সংগে সজনের আচার ও
টলটলে লেবুর রস ;
কৌটোয় ঠাসা চমত্‌কার এলাচগন্ধি মিঠে পান, এবং আমাদের
সংগে কয়েক জোড়া অভিন্ন হৃদয়
যারা প্রতিশ্রুতির দিকে হেঁটে টিলায় উঠতে উন্মুখ।

অন্য কারা য্যান এখানে আগেভাগে এসে
নাম ছিটিয়ে গ্যাছে দুহাতে, যতো খুশি, যতোদূর খুশি,
নামে নামে নামাবৃত আমাদের সব দিন, সব রাত।
অ্যাক প্রকাণ্ড শব্দকোশের মধ্যে—শব্দ, প্রতিশব্দ, প্রতিশব্দের
প্রতিশব্দ, তার মধ্যে আমরা বসে আছি,
অন্যদের অন্য কোনদিনের প্রতিলিপি মুখস্থ বলে চলেছি।
তারা কেউ নিজেদের নাম বলে যায়নি, কিন্তু আর সবার,
সব কিছুর, নাম বলে গ্যাছে।
আমার নাম রেখেছিলেন পিসিমা এবং পিসিমার
নাম রেখেছিলেন তাঁর মা ;
কিন্তু আমাদের এই চড়ুইভাতির পৃথিবীতে প্রত্যেকটি গাছের,
এমনকি পাখির শব্দের পর্যন্ত রয়েছে
কেউ-জানেনা-কে-দিয়েছিল-কেন অনর্গল সব অভিধানে-ধরেনা নাম।
এই নামৈব কেবলং য্যান আমাদের নিয়তি।

এই মান্ধাতার আমলের পৃথিবীর গায়ে অনেক ব্যাঙের ছাতা,
তবু এখানেই রয়েছে সাপখ্যালানো, মনটানা পথ—
কাকদ্বীপ থেকে সমুদ্র, ফ্রেজারগন্‌জ,

দুধারে উদয়াস্ত কাকলি, মাছরাঙার ডানা, কচি আমে সবুজিত
বাগান, এবং
বি-ডি-ওর জিপে গীতিকবিতার মতো লকলকে মেয়ে।
এরা শব্দে-আঁকা ছবি চায়, স্তব চায়, নতুন অলিখিত-পূর্ব কবিতা চায়,
এবং চায় গান যার স্বরলিপি কেউ কখনও সাহস করেনি, এবং ক্রমাগত
পুরোনো কথার সিন্দুক থেকে আমায় বেরিয়ে আসতে বলে।
আমি যতবার অবাক করে দেব ভাবি, রক্তিম স্পন্দনকে যখনই
অদ্বিতীয় শব্দে অনুবাদ করতে যাই,
পারিনা, পুরোনো মান্ধাতার আমলের নামগুলি পথজুড়ে বসে থাকে।
য্যান কোন আবেগ আর আনকোরা নেই, কোন শব্দ অশ্রুত
থাকেনি,
য্যান অনাঘ্রাত কোন কুসুম হয় না, য্যান সংসার দ্বিতীয় মুদ্রণ
থেকেই শুরু!
অতএব ব্যবহৃত উনুনে, ব্যবহৃত জল আকাশ মাটির মধ্যে
আমাদের এই চড়ুইভাতি।

তারা আমাদের বাধ্য করছে।
এই পুষ্পমাসে যেদিকে তাকাও অনামা তরু নেই, অনামী কোনো
ফুল, মালা, পুষ্পলাবী নেই,
এই ঋতুপর্ণ বনে যত কথা সবই অন্য কথার কলম ;
অন্য কোন কোকিলের প্রতিধ্বনির প্রতিধ্বনির প্রতিধ্বনি
আমাদের পঞ্চম স্বর ;
অন্য কোন প্রেমিকার প্রতিলিপির প্রতিলিপি
আমাদের ভালবাসিকা।
আমরা যখন অনন্য তখনই অন্য কেউ!
কারা য্যান আমাদের বাধ্য করছে।

আমাদের পুকুরে অ্যাত নতুন মাছের পোনা, গাছে অ্যাত
নতুন-ফলেছে জামরুল,
কিন্তু তাদের ব্যাঙের-ছাতা-গজানো নামগুলি আঁশের মতো
মাছের গায়ে, খোসার মতো সমস্ত ফলের ওপর, এঁটে বসেছে।
অন্য কারা য্যান, কি-করে, আমাদের আগেভাগে এই উপত্যকায়
এসে গ্যাছে।

তুম্‌বুনিতে সারা দুপুর

তুম্‌বুনিতে সারা দুপুর ধান পাকছে ধান পাকছে
মনের মধ্যে কি আশ্চর্য আরও কি সব কথা জাগছে।
আলোয় রোদ ছায়ায় রোদ, হাওয়ায় গান গাওয়ায় রোদ
ভাল লাগছে ভাল লাগছে ভাল লাগছে।

দুমকা যাব, দুমকা পাহাড়; দুমকা যাবে?   পথতো ভারি!
মাসানজোর না আসানবুনি?   পথ তো ভারি, পথ তো ভারি!
বুংকাতলা লালপাহাড়ি কাচপাহাড়ি শ্যামপাহাড়ি—
পাতাবাহারি শাড়ির চোখে আরও য্যান কি কথা থাকছে
ভাল লাগছে ভাল লাগছে ভাল লাগছে।

পথের মধ্যে আর অ্যাকটা পথ মনের মধ্যে আর অ্যাকটা মন,
মাঠের মধ্যে বনের মধ্যে আর অ্যাকটা মাঠ আর অ্যাকটা বন,
সারাটা দিন গানের মধ্যে আরও য্যান কি মানে থাকছে,
তুম্‌বুনিতে ধান পাকছে মাটিতে রোদ ছবি আঁকছে
ভাল লাগছে ভাল লাগছে ভাল লাগছে।

দ্বিতীয় জন্ম

আমার মতো আর অ্যাকজন এই পথ দিয়ে হেঁটে যাবে ;
ঠিক আমার মতো, হয়তো আমিই,
আমার স্বপ্নগুলি কলাইশুঁটির খেত থেকে তুলে নেবে
বোগেনভিলিয়ার পাতায় সিঁদুর ছড়াবে বিকেলে,
মেঘ নিঙড়ে বানাবে অ্যাক-গাঙ শ্রাবণ,
য্যান এক-বলকা দুধ, ফেনিল, পিপাসার উত্তর।

আমার মতো আর অ্যাকজন এই পথ দিয়ে হেঁটে যাবে,
ঠিক আমার মতো, হয়তো আমিই,
লেকের প্রত্যূষে কুয়াশায় নিশ্চিহ্ন তার মুখ,
পকেটে জারুলের মঞ্জরি, রঙিন কবরীর মতো,
য্যান লাইনোতে সদ্য ছাপা টাটকা তেইশ বছর।
নারীর কর্ণমূলে মন্ত্রের মতো উচ্চারিত নাম, কুহক—
আমি তাকে কোনদিন দেখব না।
সে আমারই মতো, হয়তো আমিই,
আমায় উপহাস করবে, দুয়ো দেবে, যার কাছে
পরাজিত হব বলে আমি অনেক কষ্ট করেছি,
আগে জন্মেছি!
আমার মতো আর অ্যাকজন এই পথ দিয়ে হেঁটে যাবে,
ঠিক আমার মতো, হয়তো আমিই,
যখন আমি ঈশ্বরের মতো অনামা, নিরাকার, অবাঙ্‌গোচর।

ডায়েরিতে চোখের জল, রেডিও খুলে উদাসীন মুখ,
ঝরনাকলম, বিমূর্ত শিল্প, বেহালা,
স্কাইস্ক্রেপার, শংখচিল, কবোষ্ণ নদী,
গ্রীষ্মের গুলমোর এবং প্রস্ফুটিতা নারী,
এবং সেই আর অ্যাকজন যাকে কোনদিন দেখব না।

আমার মতো আর অ্যাকজন এই পথ দিয়ে হেঁটে যাবে,
ঠিক আমার মতো, হয়তো আমিই,
তার জুতোয় ফিতে নেই যে আমি খুলব,
কপালে তাপ নেই যে মুছাব ;
তার কণ্ঠস্বর আমার শুশ্রূষা, কিন্তু আমি তা শুনতে পাব না
আকাশের অবাক তার চোখে, আমারই মতো ;
বর্ষার অজস্র জল, শরতের শাদা-বুটি-দেওয়া নীল,
মাটির অগাধ শান্তি সেও পাবে ;
তবু আমার ও তার কণ্ঠের মধ্যে অ্যাক বিরাট জলপ্রপাত
যা শব্দকে অন্ধ করে।

আমার মতো আর অ্যাকজন এই পথ দিয়ে হেঁটে যাবে,
ঠিক আমার মতো, হয়তো আমিই,
খামের মধ্যে ভাঁজকরা আমার আনন্দগুলি
জানলা দিয়ে ছুঁড়ে দেবে পথে, হেয় করবে,
আমার মাঝরাতের কফির পেয়ালা
খোলামকুচির মতো ভেঙে টুকরো করবে,
সেই উদ্ধত মানুষটিকে আমার ভাল লাগে,
কিন্তু তাকে আমি কোনদিনই দেখব না,
তার কাছে পরাজিত হবার সাক্ষাৎ সুযোগ আমি পাব না।

আমার মতো আর অ্যাকজন এই পথ দিয়ে হেঁটে যাবে,
ঠিক আমার মতো, হয়তো আমিই।
কাটলেট জুড়োবে, মাখন গলে যাবে, আমার উঠবার সময় হবে,
কিন্তু সেই আর অ্যাকজন আরও অনেক পরে আসবে।
তখন আবার ভরে উঠবে পেয়ালা,
ভিড় করবে ফাল্‌গুনের পরিরা, খই ফুটবে ঠোঁটে।
আমি তখন সমালোচনার শরব্য, অলক্ষ্য,
দেখবনা, জানব না, শুনব না।

আমার মতো আর অ্যাকজন এই পথ দিয়ে হেঁটে যাবে,
ঠিক আমার মতো, হয়তো আমিই,
আমার এই বোগেনভিলিয়া, শ্রাবণ এবং কাজুবাদাম
তাকে সুখ দেবে, স্বাদ দেবে,
আকাংক্ষা থেকে আকাংক্ষায় টেনে নিয়ে
দিশাহারা করে তুলবে,
আমারই মতো।

তার অনাগত স্বেদ আমার মুখে,
তার দুঃখে আমি দুঃখী,
কারণ সে আমারই মতো আরেকজন,
হয়তো আমিই।

গ্রহান্তর থেকে

শুধু স্মৃতি তার পুরোনো উপবৃত্তে এখনও ঘুরছে,
বারো মাস ছয়ঋতুর ক্যালেন্‌ডার এখন শুধু মনের দেয়ালেই।
যে-শৈশব-কৈশোর থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম অ্যাকদিন
তারই মতো পৃথিবীও আমায় অধিকার করেছিল, মুগ্ধ করেছিল ;
মন ভুলাতে গাভী দিয়েছিল, দুধ দিয়েছিল, নারকেলের স্বাদু শাঁস,
নদীর সুপেয় জল, এবং মানুষ ভুলানো পরি, এবং পরির গল্প,
এবং অনেক অ্যামন আঁকাবাঁকা পথ যার ওপর হাঁটতে হাঁটতে
কোনদিনই আমার চলা শেষ হত না।

পৃথিবী অনেক জাদু জানত!
প্রতিমাসে প্রকাণ্ড অ্যাকটা চাঁদ ছুঁড়ে দিত আমার শিয়রে,
সমুদ্রকে ডেকে আনত গংগার উজানি জেটিতে কলকাতায়,
এবং নিঃশব্দ ব্যালকনিতে ডেকে নিয়ে আমায় ভয় দেখাত
যে-ভয় পৃথিবীর মতোই অতলস্পর্শ সুন্দর।

শুধু স্মৃতি তার পুরোনো উপবৃত্তে এখনও ঘুরছে।
আমি এখানে অ্যাক আশ্চর্য উপনিবেশ গড়ে তুলেছি—
মহাজাগতিক রশ্মির তরংগচ্ছটায় উজ্জ্বল মহানীড়।
পৃথিবীর সহস্র বৎসর আমার লহমা, ক্ষণকাল ;
মহারশ্মির তির্যক পথ অ্যাখন আমায় টানছে,
আরও কোটি কোটি আলোবর্ষ মহাদিগন্তে ছড়ানো—

তারা টানছে, য্যামন করে পৃথিবী অ্যাকদিন
বিদ্যাধরী নদীর আঁকাবাঁকা পথের দিকে আমায় টেনেছিল।
বেতারতরংগ পাঠিয়ে এখনও হয়তো সেই পৃথিবীকে ছোঁয়া যায়
যে-পৃথিবী অ্যাখন আমার আকাশি লেখচিত্রে কনিষ্ঠতম ফুটকি,
বিস্মৃত অন্ধকারের জোনাকির মতো এখনও আমায় সে হয়তো
চমকে দিতে পারে,
পারে উট্রামঘাটের জেটিতে টেনে নিয়ে গংগার ধূসর আহ্লাদের
দোসর করে দিতে।
শুধু স্মৃতিই নয়, আমিও হয়তো পুরোনো উপবৃত্তে এখনও ঘুরছি।

তখন থেকে তারপর

নিরন্তর সংসারের তখন থেকে তারপর ;
আপনি জ্বলে ফুলঝুরিটা, ফুলকি শাদা মর্মর
সৃষ্টি করে, দৃষ্টি পোড়ে, বীজের মধ্যে বনটা
বাড়তে থাকে, আলতা পরে ঝোড়ো ঈশান কোণটা।

এখানে-নয় ইচ্ছেটাকে সেখানে-নয় দুই চোখ
ঘোরায় শুধু ঘোরায় শুধু, ঈপ্সা গড়ে নির্মোক,
বন্দী করে সদ্য-বাইশ ঈষত্-টানা পল্লব
সিক্সটি-কিলো স্পিডে স্কুটার ছোটায় প্রাণবল্লভ।

সিঁড়ির ‘কাল-কখন ?’ চাওয়া আহা-কি-ভাল সন্ধ্যায়
দেওয়া-নেওয়ার লগারিথম হিসাব করে, মন সায়

দ্যায় না, দেয়াল-ক্যালেন্‌ডারে কি-য্যান্‌-বাধা চমকায়
জাহাজ কাঁপে অচেনা নীল সমুদ্রের দমকায়।

রেশম-ঢাকা বুকে শুশুক যখন দ্রুত আছড়ায়
বায়না ধরে বসন্তকাল, হাজার গাছ-গাছড়ায়
মেলেনা কোন প্রতিষেধক, এইতো-ভালো মাঠটায়
শিশ দিয়ে ট্রেন লেভেল-ক্রসিং পার হয়ে যায় আটটায়।

চিঠির বাক্সে গোপনে-টুপ দুষ্টু মেয়ের মনটা ;
বোনকে দিয়ে টফির প্যাকেট আলগোছে ন্যায় ফোনটা,
হয়তো ঝুঁকি বড্ড বেশি, বড্ড বেশি রিস্‌কি
মনে যে তার বিমূর্ত রঙ ক্লি বা ক্যান্‌ডিনিস্কি।
আঙুর-টক ইচ্ছাগুলি হয়তো পরিপক্কই,
নিপুণ-ধার আলপিনেতে বিঁধেছে ঠিক লক্ষ্যই ;
ফুলের তোড়া উঠবে ফুটে একদা-অ্যাক মাঠটায়,
শিশ দিয়ে ট্রেন লেভেল-ক্রসিং পার হবে ঠিক আটটায়।

কোথাও-নেই খুঁজে খুঁজে কি-হবে দিন যায় যায়
চোখের মনে-রবে-কি টুকু স্বপ্ন হয়ে পায় পায়
ঘুরে ব্যাড়ায় ঘুরে ব্যাড়ায়. বীজের মধ্যে বনটা
বাড়তে থাকে, আলতা পরে ঝোড়ো ঈশান কোণটা।

বাড়িটা

এখানে বাড়িটা উঠবে, ওখানে
গাড়িটা দাঁড়াবে, মাধবীলতার
দীর্ঘ দেহকে রাখবে দেয়াল
আলগোছে ছুঁয়ে—নিছক খেয়াল,
নিছক স্বপ্ন, পাতার বাহার।

এখানে বাড়িটা বাড়বে, ক্রমশ
দ্বিতল, ত্রিতল, মেঘ-ছুঁই-ছুঁই,
টবের উঠোনে শাদা শাদা জুঁই,
ছাদে ছেলেটার ঘুড়ির লাটাই
ঘুরবে শ্রাবণে, উঠবে হাউই।

এখানে বাড়িটা—শুধু বাড়ি নয়,
আরও কিছু মুখ, কোণের জানলা
আলোছায়া-ঘেরা টি-ভি সেট য্যান
আরও কিছু ছবি মোনালিসা-মুখ
শুধু বাড়ি নয়, আরও কিছু সুখ।

এখানে বাড়িটা হেলবে একটু,
ফাটবে দেয়াল, কিছু বালিচুন
খসবে, পাখিরা নানা খড়কুটো
ফেলবে তলায় টেলিফোনে গলা
চড়বে একটু ঈর্ষ্যায় জ্বলা।

এখানে বাড়িটা, অতি নামী বাড়ি,
উঠবে নিলামে, দামি গাড়িটাও
কিনে নেবে কেউ, হয়তো শোফারই,
দেয়াল এবং মাধবীলতার
চিহ্নও কোন থাকবে না আর।

জল নদী মাছ

জলে ডুবে থাকে মাছ ডোবেনা কিছুতে।
জল য্যান মরুভূমি,
বিতৃষ্ণ মাছের কাছে
জল য্যান নিরোর বেহালা।

কঠিন রুদ্রাক্ষমালা আঙুলে ঘোরানো
এই শুষ্ক আর্দ্রতা কি স্রোতস্বতী নদী ?
বাঁকে বাঁকে ঘুরে ফিরে সেই অ্যাক তরল কাহিনী,
নদী বল ?
স্রোত য্যান অন্য অ্যাক স্থিতি
দ্রুত পায়ে হেঁটে-যাওয়া চলিষ্ণু বিরতি।
নদী !

জলের সংসারে এসে ডুবে দ্যাখ
ছদ্মবেশি বালুকণা ফোঁটা ফোঁটা—
জল কাকে বল ?

নদীর স্তব্ধতা এসে ঘিরেছে আমাকে
ধূসর ঢেউয়ের মতো,
আমি মাছ।

অ্যাত জল ক্রমাগত, ভাটিয়ালি জল,
কূলের উৎসব নিয়ে গরবিনী নদী।
আমি ডুবে আছি, তবু—
সারা জন্ম ডুবে আছি, তবু—
স্রোতের উত্‌সবে নেই, উত্‌সে নেই,
কূলে কিংবা কলস্রোতে, বর্ষার মৃদংগে কিংবা
উত্‌সাহী জোয়ারে, আমি নেই,
আমি শুধু
নামহীন, স্বাদহীন, বর্ণহীন জলে
ইতিহাসহীন অ্যাক আদিম নদীর স্রোতে
ক্রুদ্ধ অবরুদ্ধ মাছ।

হয়তো বা এ-ই নদী,
কারও কাছে ;
হতে পারে, এরই নাম নদী ;
ডাঙা থেকে যারা ডাকে তাদের গলার স্বরে মিশে
এই আর্দ্র মরুভূমি নদী হয়, হতে পারে।

কিন্তু আমি
সামান্য গরিব মাছ
ভাষাহীন পরিভাষাহীন
ইতিহাসহীন অ্যাক আদিম নদীর স্রোতে
অবরুদ্ধ।

অনেক দেখেছি ডুবে।
জলে ডুবে যদি দ্যাখ,
জলে কোন নদী নেই—
শুধু জল ;
স্রোতে কোনো জ্বালা নেই, দাগ নেই—
শুধু জল।
আমি মাছ
জলে পড়ে আছি আমি, জলে পুড়ে আছি,
জল য্যান নিরোর বেহালা।

আমার মৃত্যুর জন্য

আমার মৃত্যুর জন্য ···
আমার মৃত্যুর জন্য ···
আমার মৃত্যুর জন্য কেউ ··· ।

যে-মৌমাছি দিয়েছিল
কিছু মধু, কিছু মোম, সেও,
যে-করবী ঝরেছিল না ফুটেই,
যে-ট্রেন লাইন ছেড়ে মাটি ছুঁতে গিয়েছিল,
যে-জাহাজ ফেরেনি বন্দরে।

তিলে তিলে পলে পলে
এই মৃত্যু গাঢ় হল
পরিপক্ক ফলের মতন।

প্রথম যে সন্ধ্যাতারা
খুঁজেছিল বুকের বিদ্যুত্
চম্পকিত প্রথম বৈশাখে
তার কোন দায় নেই।

শরতের শীর্ণকায়া নদীকে শুধাও,
তারও কোন দায় নেই ;
আলতা-ঠোঁট চৈত্রের আকাশ
ঝড় আর রক্তচূড়া অ্যাক করে দেখেছিল,
তারও নেই
কারও নেই
কারও কোন দায় নেই।

মৃত্যুরও বয়স আছে,
সেও জন্মে, ধীরে ধীরে বাড়ে,
তারও বীজ রাত্রির কুহকে উপ্ত।

সে কখন দাঁড়াবে শিয়রে
অথবা নদীর গর্ভে ঝাঁপ দিতে নেবে,
কিংবা অ্যাক নিষ্পেষিত রমণীর আঘাতের মুখে
তোমার ইন্দ্রিয়-দেহ ছুঁড়ে দেবে ছিন্নভিন্ন হতে,
অথবা হৃত্পিণ্ড-মূলে ছড়াবে বারুদ,
সেই জানে।

রক্তের স্রোতের মধ্যে ডুবে থাকে
শিরায় শিরায়,
তাই সে অজ্ঞাত।

মৌমাছি, করবী, ট্রেন, বন্দরে জাহাজ,
সন্ধ্যাতারা, চম্পক, বা নদী—
আমার মৃত্যুর জন্য…
আমার মৃত্যুর জন্য…
আমার মৃত্যুর জন্য কেউ…।

মংপু

দিগন্তে ছাই রঙ ঢালা
উর্ধে রেখা কাঞ্চনজংঘার
এখানে বৈশাখ-শেষে
দেখা হল তোমার আমার।

এই রক্তকরবীর গুচ্ছ আর
ওই ভুঁইচাঁপা
এরই মধ্যে তোমার স্বাক্ষর
রঙে রঙে কাঁপা।

তিক্ত সিংকোনার ডালে
রক্তিমাভ পাতা,
লেবুগন্ধি ঘাস আর আঙুর স্তবক
অ্যাক্‌সূত্রে গাঁথা।

ফুলের উত্‌সবে মাতে
বেগ্‌নি-রঙ জাকারান্দা শাখা
চপল বৃষ্টিতে ধোয়া ঝরে-পড়া ফুল
সেই রঙে মাখা।

মংপুর আকাশে বনে
পাহাড়ে ও পাহাড় প্রান্তরে
একটি তুলির রঙ—আশ্চর্য তুলির—
শুধু খ্যালা করে।

বৃষ্টিতে ধোয় না রঙ
হাওয়ায় মোছে না,
মৃত্যুর ঝড়েও জানি
এ রঙ ঘোচে না।

মংপুতে বৈশাখি জলে
আঁকা অ্যাক জলরঙা ছবি,
তার মধ্যে তুলি হাতে তুমি
বসে আছ কবি।

সাত মাইলের বাঁকে

চেঁচিয়ে ওঠে পাশের সিটে বাসের যাত্রী—"রোখকে",
চেঁচিয়ে উঠি আমিও, নামি, নামাই দুই চোখকে
যশোর রোডে, তাকিয়ে দেখি অ্যাখনও বাকি সন্ধ্যার,
এপাশে লাল রক্তচূড়া ওপাশে লাল মন্দার।

বিরক্ত হন যাত্রিণীরা ; "স্টপ কি আছে থামবার ?
শূন্য মাঠে অ্যামন করে দরকার কি নামবার ?"
গর্জিত বাস থমকে দাঁড়ায়, বেকুফ বনে ড্রাইভার,
কার বা আছে সময় অ্যাখন শূন্য পানে চাইবার ?
পিচের পথে ততক্ষণে যাত্রী ও কন্‌ডাক্‌টর
অনেক দূর এগিয়ে গ্যাছে, আকাশি অ্যাক ট্রাকটর
মেঘের পর রঙ বুনেছে, অ্যাখনও বাকি সন্ধ্যার,
এপাশে লাল রক্তচূড়া ওপাশে লাল মন্দার ।

পারিনে আর পারিনে আর—তুলিতে টানা প্রান্তর,
আকাশ আজ ক্রিসেন্‌থিমাম, আর সবই অবান্তর ;
রঙ ধরেছে বনে এবং বুনো পাখির ঝাঁকটায়
রঙ ধরেছে আকাশে এই সাত মাইলের বাঁকটায় ।
সকালব্যালা দিনটা গ্যাছে অ্যাক্‌কেবারে রঙ-ছুট,
ট্যাংকে মোটে জল ছিল না, শুকনো করসম্পুট ;
টেবিলে কালি উলটে ছিল, ময়লা ছিল কোণটায়,
কুকুর ডেকে উঠেছিল অটোমেটিক ফোনটায় ।

নষ্ট তবু হল না দিন, সাত মাইলের এই বাঁক
পূর্ণ করে দিল আমার সারাদিনের সব ফাঁক,
কলকাতায় ফিরব যখন তখনও রবে সন্ধ্যার
এপাশে লাল রক্তচূড়া ওপাশে লাল মন্দার ।

দীপ্তি ও বিআত্রিচে

বন্ধ ছিল জানলা দুটো, অন্ধ ঘুমে মনটায়
দীপ্তি এসে দাঁড়িয়েছিল নিদ্রায়িত কোণটায়,
দেয়ালে ইনফার্নো ছিল শ্লোক ছিল অলক্ষ্যে
বাইনোকুলার দৃষ্টি শুধু ছিলনা এই চক্ষে।

হঠাত্ যেই চমকাল মন, চমকাল মেঘ প্রান্তে,
রাত্রি হল বিআত্রিচে আমি হলাম দান্তে,
সেতুর মুখে থমকে গেলাম, মর্ত এবং স্বর্গ
পেরিয়ে আমি নরক পেলাম, পেলাম চতুর্বর্গ।

বুকের মধ্যে শব্দে বোনা গোপন টাইপরাইটার
ঘুম ছুটাল চোখের, এবং মাঠের কালো গাইটার
দুগ্ধফেনা উপচে পড়ে রাতটা হল ফর্সা
চাঁদের নিচে রইলো না আর আবছায়া বিমর্ষা।

রাত্রি যদি বিআত্রিচে, প্রেম যদি হয় অন্ধ,
দীপ্তি তবে দান্তে কবির তের্জারিমা ছন্দ :
তীব্র আলো-অন্ধকারে কথার নির্লিপ্তি
অহংকারে নাম ধরেছে শব্দবতী দীপ্তি।

ফ্রিজের মধ্যে ছিল মাখন, ঘুলঘুলিতে পায়রা,
বাক্সে ছিল গুণবতীর শিরোভূষণ টায়রা,
বন্ধ ছিল জানলা দুটো, অন্ধ আমার মনটায়
দীপ্তি এসে দাঁড়িয়েছিল নিদ্রায়িত কোণটায়।

পরদিন

আমার মৃত্যুর পরদিন
আকাশ অ্যাকেবারে অপরাজিতা-নীল, য্যান কখনও
ঝড় ওঠেনি, ধুলো ওড়েনি,
সারা মাঠ বাসমতী আর গম, সমস্ত বাগান আম আনারস আর
আঙুর
অ্যাকদিনেই পৃথিবী অ্যাকেবারে পাল্‌টে গ্যাছে ;
গোরুতে অ্যাত দুধ, হ্রদের জলে অ্যাত স্বাদ, দিনে অ্যাত
আলো, রাতে অ্যাত সুখ,
এ সবই য্যান আমাকে জব্দ করার জন্য।

আমার মৃত্যুর পরদিন
পৃথিবী অ্যাকদিনেই অ্যাকেবারে পরিপাটি।
ব্যাটারি-ডাউন গাড়িটা কে-জানে-কি-করে আপনা থেকেই স্টার্ট
নিয়েছে ;
নদীতে জন্মে-দেখিনি-অ্যাতো মাছ, ব্যাংকে গুণে-শেষ-করা-যায়না-
অ্যাত টাকা,
এবং দোকানে বললে-বিশ্বাস-করবেন-না কি আছে আর কি নেই!

আমার মৃত্যুর পরদিন
পারাবত উড়ে গ্যাছে সমুদ্র পেরিয়ে রেডিও-ওয়েভের মতো
পুবে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে,

এ-দেশের বাইশ সে-দেশের একুশের হাতে হৃদয় রেখেছে
এবং এ-সব-কিছুই স্থগিত ছিল যতদিন আমি বেঁচে ছিলাম।
য্যান হিংসুটে মুদ্রাকর নিমন্ত্রণের চিঠি প্রেসে কম্পোজ করে
ফেলে রেখেছিল আমায় বাদ দেবে বলে,
এবং আমার মৃত্যুর পরদিনই জরুরি 'প্রিন্ট অর্ডার' দিয়ে দিয়েছে।

আমার মৃত্যুর দিন
খনিতে বিস্ফোরণ, ঐরাবতের শুঁড়ে বাগিচা ওলট পালট,
ট্যাংকে অ্যাক ফোঁটা জল নেই, মেইন কারেন্ট শূন্য,
টেলিফোন ডেড, পাখা অচল, য্যান গোটা সংসারেই লালবাতি,
হার্মনিঅমের রিড টেনে উপড়ানো, বেহালার ই-এ-ডি-জি
ওলট পালট,
এবং জামার সব বোতাম অদৃশ্য।
মনে হয়েছিল, বেঁচে থাকার কোন মানেই হয় না।

কিন্তু ঠিক পরদিনই
পৃথিবী অ্যাত পালটে যাবে কে ভেবেছিল?
পরদিন, যখন পৃথিবীকে জব্দ করেছি বলে
উল্লসিত হব ঠিক তখনই,
হঠাৎ পুকুরে জাল ফ্যালার শব্দ, ড্রইংরুমে ম্যান্‌ডোলিন বাজছে,
ডালহৌসি পাহাড়ে বন্ধুরা চায়ের আসরে জমায়েত, এবং
টেলিভিশনে প্রাইমা ব্যালেরিনার দিলবাহার নাচ!

আমার মৃত্যুর পরই
পৃথিবী অ্যামন পালটে গ্যাছে, আশ্চর্য!
অ্যাখন এদিকে তাকাও আলো, ওদিকে তাকাও উৎসব,
ভাল, আরও-ভাল, এবং আরও-আরও-ভাল;

আকাশের সব মেঘ গাছের শিকড়ে বিগলিত,
সব গাছ ছড়িয়ে দিয়েছে ডাল, এবং ডাল তুলে ধরেছে ফুল,
প্রত্যেক ফুলে মধু এবং প্রত্যেক খোঁপায় ফুল,
মরে যে কি ভুল করেছি কি বলব !

ভেবেছিলাম, মরে বাঁচব।
পৃথিবীর মুখে অ্যাত কষ্টের দাগ, পিঠে অ্যাত কালশিটে,
পথে ক্রমাগত কাঁটা এবং লক্ষ্য দুরন্ত্ ;
চারিদিকে নিষেধ ও কাঁটাতার, ক্ষুধার্ত হাতে শূন্য থালা,
এবং চোখে দুঃস্বপ্নের কংকাল-নাচ।
আমি একটু ঘুমোতে চেয়েছিলাম,
বকুল গাছের নিচে সামান্য একটু মাটির আরাম,
একটু বাঁচা !

কিন্তু আমার মৃত্যুর পরদিন
পৃথিবী যে অ্যাকেবারেই পালটে গ্যাছে, বিশ্বাস হয় না।
নিজের হাতে তৈরি দেয়াল-ঘেরা বাড়িটা য্যান অন্য কারও,
ছিলাম-আমি য্যান ছিলাম-অন্য-কেউ।

এই যে ফুলদানিতে রঙনের স্তবক, ফটকে স্বাগতম্-শানাই,
সকালের টেবিলে মাখন, লেটুস, স্লাইস রুটি এবং ওলকপির কুচি,
অতিথির জন্য সরভাজা, গোকুল পিঠে, বন্ধুর জন্য ক্রিম-কফি,
স্পন্জ পুডিং ও কলাইশুঁটির খিচুড়ি,
মধ্যাহ্নে ইচ্ছেমতো বিরিআনি বা বাগদাচিংড়ির পোলাও এবং
মোল্লারচকের দইয়ের মাথা।
একি স্বপ্ন, না মায়া ?

আমার মৃত্যুর পরদিন
পাড়ার নেড়ি কুকুরটাও সিংহের মতো গর্জাচ্ছে,
নড়বড়ে গাড়িবারান্দায় নহবত, নতুন যৌবনের দূতরা
দখল নিয়েছে সেখানে ;

মাধবীলতার নিচে এইমাত্র-এল ফ্যাক্টরি-প্রসূত বাদামিরঙের
ফিয়াট, হর্নে নিবিড় আহ্বান,
এরিএলে দূর নৈকতের স্বর, হেডলাইটে কুয়াশা-ভেদি আকাংখা।
অ্যাখন সুন্দরী তন্বী ছাড়া নারী নেই, যৌবন ছাড়া বয়স হয় না,
ফুল-ফুটতে-বিলম্ব অ্যামন বাগান চোখে পড়ে না, এবং
ক্যালেন্‌ডারে সব তারিখ লাল।

আমার মৃত্যুর পরদিন
পৃথিবীর এই ভোল-পালটানো এ য্যান আমাকেই জব্দ করার জন্য
আমার সেই পোড়-খাওয়া জীবনটার জন্য অ্যাখন মায়া হয়।
সেই সব কালশিটের দাগ, পায়ে বেড়ি, পথে অ্যাকশো চুয়াল্লিশ,
ফুটপাথে কম্বলমুড়ি রাত এবং ফ্যান চেয়ে না-পাওয়ার জ্বালা,
সেই অসহ্য পৃথিবীকে য্যান কারা রাতারাতি গুম করেছে
আমাকে জব্দ করবে বলে।
অ্যাখন ঈর্ষার বিষে আবার মরি এই তো তাদের কাম্য ?
মরে ভুল করেছি, অ্যাখন
বেঁচে আরেকবার ভুল করতে চাই।

বাবু ও জটি বুড়ি

পৃথিবীতে তারও ঠাঁই আছে—
সেই বাবু
চিকন ঘোরানো ছড়ি, মিহি ধুতি,
ইলেক্‌ট্রিক শেভারে মসৃণ মুখ, ব্যাক্‌ব্রাশ
মনে হয় কোনকালে গুণী,
শনির দশায় আজ আধবুড়ো, ন্যুব্জ দেহ,
ঘোড়ার পেছনে তবু ছোটা চাই ভূতে-পাওয়া প্রতি শনিবার।
বিগত জুলাই মাসে বিড়্‌বিড় নিজেকে বল্‌ছিল বাবু ঃ—

"ইচ্ছে করে, ঘোড়া হই নিজে
নিজের ভাগ্যকে নিয়ে ছুটি, জিতি,
অথবা ভাগ্যকে নিয়ে ভেঙে পড়ি
ফোর্টের চূড়ায় কিংবা বেহালার বড় টাঁকশালে
তারপর হই মনুমেণ্ট কিংবা
ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ মর্মর-প্রাসাদ
সাদা—সাদা—সাদা—
জীবন-কাব্যের শেষ পাতা।"
মৃত্যু দিয়ে জীবনকে মেপেছে সে
তারও ঠাঁই আছে।

তারও ঠাঁই আছে—
জটি বুড়ি
দেয়ালে ঘুঁটের মতো থ্যাবড়ানো মুখ
গোরুকে বিচালি দ্যায়।
ধানি-লংকা-চেরা গলা
গলা-কাটা বটির মতন ধারালো ভাষায়
গালিমন্দ পাড়ে যাকেতাকে,
গোরুকে বিচালি দ্যায়
শতচ্ছিন্ন কাঁথাখানা বাঁশের ব্যাড়ার পর রোদে রাখে,
উকুন-ঘিনঘিন চুল—
নিস্তেল দীপের পোড়া পাকানো সলতের অবশেষ!

হাতে সেই কবেকার বাজুবন্ধ আসল চাঁদির
গোরুকে বিচালি দ্যায় জটি বুড়ি গোরুকে বিচালি দ্যায়
'আদমি'টা কোথায় যে গ্যাল, ফৌজে কি জংগলে,
হায় মুহব্বত!
লড়কিকে যমে নিল সেবার আকালে
নিল না জটিকে শুধু
ফ্যান চেয়ে খেয়ে খেয়ে জিন্দগিটা রয়ে গ্যাল
রয়ে গ্যাল বাজুবন্ধ আসল চাঁদির।
দেয়ালে ঘুঁটের মতো থ্যাবড়ানো মুখ
গোরুকে বিচালি দ্যায় জটি বুড়ি।
তারও ঠাঁই আছে।

মন্ত্রদ্রষ্টারঃ

যোগাসনে বসেছেন ধ্যানী নিউটন।
কল্যাণের মন্ত্র রচয়িতা, কর্মে, জ্ঞানে।
একালের নব অংগিরস আইনস্টাইন
মন্ত্র পড়ে শোনালেন—
$e = mc^2$ [ই সমান এম-সি স্কোয়ার]।
মংগলে কি শনির বলয়ে
চাঁদের ওপিঠে কিংবা ছায়াপথে
তোমাদের ছাড়পত্র নিয়ে যাই
তোমাদেরই বীজমন্ত্রে কালজয়ী রকেট গড়াই,
সৌরতেজ থেকে আনি নবতেজ, পরমাণু থেকে ভ্রূণ নবজীবনের,
সভ্যতাকে ভেঙে গড়ি আমি আলাদিন,
তোমাদের ধ্যান জ্ঞান কর্মের মায়াবী দীপ জ্বেলে
আশ্চর্য সকাল আনি, আশ্চর্য সংসার।
সবচেয়ে সত্য ইতিহাসে
দিগন্তের য়ুটোপিয়া,
সবচেয়ে কল্পনা-রঙিন মায়াময়
সবচেয়ে সার্থক বাস্তব।
যদি কোন দেশ থাকে যার নাম তেজ
যদি কোন গতি থাকে যা ইথারে স্থির
কেন্দ্র আর চক্রনেমি সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের—
তবে সেই অসম্ভব বাস্তব সত্যকে জানি
তোমাদেরই বীজমন্ত্র বলে;
তোমাদেরই দিকে চোখ মেলে কৃতাঞ্জলিপুটে বলি
'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।'

পৃথিবীর মুখ

আমি যে দেখেছি মুখ পৃথিবীর, রোদে ঝলসানো
দাউ দাউ অপরূপ রূপ,
ঝড়ে তার আত্মার বিদ্যুত্‌, প্লাবনে করুণা,
উপপ্লবে বিপ্লবে অমর।

খনির নিরন্ধ্র গর্ভে হীরকের দ্যুতি,
শ্বাপদ-অরণ্যে মক্ষী মধুচক্রে রত গুন্‌গুন্‌
এ অ্যাক পৃথিবী য্যান রৌদ্র-কিরীটিনী,
ভয়ংকরী অথচ সুন্দরী।

দেখেছি পৃথিবী অ্যাক ক্ষুধায় করুণ
উপবাসী মন্বন্তর দিনে—
আকাশ করুণা-রিক্ত হৃদয় নির্দয়,
ক্ষুধার্ত কাকের ভিড় দিগন্তের নীলে ;
নিঃসার মাঠের শস্য, বন্ধ্যা ওষধিরা
বনস্পতি ফলশূন্য, ক্লীব মেঘ, স্রোতোহীন নদী
পংক-শেষ সরোবর, বিশুষ্ক নির্ঝর,
বিরল বনের ফল, নীরব কাহিনী—
ক্ষুধার্ত কাকের ভিড় নিরুত্‌সব দেশে।

আবার দেখেছি মুখ পৃথিবীর
সন্ধ্যার নদীর জলে আলো-ছায়া—
নলখাগড়ার বনে,
বুনো শুয়োরের কিংবা সজারুর ঘর্ষণে-কর্কশ ত্বকে
ছায়ার আরতি।
মাছের বুদ্‌বুদ্‌গুলি ক্রমান্বয়ে মিলে গ্যাছে
নৈঃশব্দ্যের ঐকতানে,
মিশে গ্যাছে জলের রেখায় ;
তারপর গাঢ় রাত্রি
পৃথিবীর নিবিড় শরীরে
ঢেলেছে আদিম বিষ তীব্র মধুমাখা—
মাঝরাতে ডাকেনি কোন সারস কিংবা জাগেনি কপোত-
মূর্ছিতা পৃথিবী।

আবার দেখেছি আমি কতদিন ভোরে
রাতের আবর্ত শেষে বন্ধু-রোদ মুছে দিলে গ্লানি
শিশিরের বুটি দেওয়া কাঞ্জিভরম্ পরা মাঠ
অ্যাক ঝাঁক পায়রা-হাসি হেসে কোলে তুলে ন্যায়
নরম তুলোয় মোড়া খরগোস
দেবদারু গাছে তুলে দ্যায়
আঙুল-বুলানো-পিঠ কাঠবিড়ালির ছানা,
নীল-কালো আকাশে হাল্কা ঘুড়ির মতন
পতংগ উড়িয়ে টানে স্নেহের সুতোয়।

মাঠ—
সকালের প্রসন্ন পৃথিবী।

ভয়ংকর ঝড়

ঝড় উঠেছিল রাত্রে,
আজ নয়। সেদিন যখন
ধান খুঁটে কবুতর নীড়ে গ্যাল, সেদিন যখন
সন্ধ্যার রঙের বাক্স ঢেলে দিল উট্রাম ঘাট,
ইডেন গার্ডেনে এল সরীসৃপ ছায়া
বোট থেকে প্যাগোডায়, গাছ থেকে ছাই-কালো মেঘে,
ক্রমশ ছড়াল আরও
নেমে গ্যাল গংগার জেটিতে, জলে, জলের তলায়,
নিষ্পাখি আকাশ থেকে মাছের সংসারে, নিচে
শ্যাওলা-শীতল ঘন সমতলে,
তখনও ঝড়ের গন্ধ পায়নি পাইন গাছ, শুধু কাক-কালো
দিগন্ত রেখায় মৃদু হ্রেষাধ্বনি শুনেছিল ডকের শ্রমিক।
হাওড়াব্রিজের পর সহস্র সহস্র যাত্রী কেউ ট্রামে কেউ পায়ে হেঁটে ;
ট্রেনের সময় হল,
ইলেকট্রিক ট্রেনে যাবে, তাই উর্ধশ্বাস
কারও বা থলিতে নানা টুকিটাকি বাড়ির ফরমাশ,
কারও বা পকেটে
আহ্লাদি মেয়ের জন্য প্লাস্‌টিকের চুড়ি কিংবা রেশমের ফিতে—
তারা কেউ হ্রেষাধ্বনি শোনেনি আকাশে,
কাক-কালো দিগন্তরেখায়
দৃষ্টি কিংবা মনোযোগ ফিরায়নি কেউ ;
লন্‌চের শিটিকে তারা ইলেকট্রিক ট্রেনের শংখ ভেবে
দিশাহারা।

বহুক্ষণ স্তব্ধ ছিল দিনান্ত-আকাশ
নিবাত নিষ্কম্প থমথমে ;
ভাসমান বয়া স্থির গংগাজলে।
সন্ধ্যার প্রহর গ্যাল, এল রাত,
এল ঝড় এলোমেলো দিগন্তে বুক-কাঁপা
শিং-বাঁকা আক্রোশে ক্রুর
রক্তিম রোষের মতো অন্ধ ভয়াবহ
কর্কশ পরুষকণ্ঠ,
ঝড় এল মাটিতে—
জলশূন্য শুষ্ক ঝড় ;

ধূলায় আকীর্ণ হল ছাদের কার্নিশ, টব, চিলেকোঠা ;
জানলায় দরজায় দিল হানা আততায়ী
কোথাও খড়খড়ি তুলে দৃষ্টির ছোবল দিল,
নাড়া দিল শো-কেসের কাচে,
ফুটপাথের বনমহোত্‌সবে রোপা বকুলকে ;
বস্তির খোলামকুচি-ছাদে দৌড়ে গ্যাল য্যান মত্ত অনড্বান্
ছড়িয়ে ছিটিয়ে দুমড়ে তছনছ—কুটি-কুটি মাটির সংসার,
ভগ্ন-শাঁখা বধূ য্যান সর্বস্বখোয়ানো রিক্ত লুণ্ঠিত ধূলায়
হা-কপাল আর্তনাদ সার।

মাটির বর্তুল এই স্থূল পৃথিবীটা
ঝড়ের চাপড়ে চ্যাপ্টা ; প্রকৃতির সব ছাঁচ ফাটা ;
বহ্নির শীত্‌কারে আর বৃষ্টির ফুত্‌কারে
বীভত্‌স উল্লাস নৃত্য।

এই ঝড়ে আমি য্যান রয়েছি দাঁড়িয়ে
রিক্ত অ্যাক জরাগ্রস্ত অশক্ত ঘৃণিত বৃদ্ধ
লিয়রের মতো।

যত গড়ি তত ভাঙে
এই ঝড় ততবার হানা দ্যায়।
সাজানো কাচের ঘরে অতিথি-রোদের জন্য যত সমারোহ
চূর্ণ করে দ্যায় সব ঝড়ের দিঙ্‌নাগ,
ইলেকট্রিক ট্রেনের তার ছিঁড়ে মাঝপথে আটকে দ্যায়
আবদারি মেয়ের চুড়ি রেশমের ফিতে,
বাপের কল্যাণ স্নেহ, দিনান্তের কাংখিত মিলন।
ভয়ংকর ঝড়।
এই ঝড় বিকিরণে মাতে
ভয়ার্ত পাখির বাসা ভাঙে নীল দ্বীপে,
কবোষ্ণ বাহুতে বোনা আলিংগন থেকে
দয়িতকে কেড়ে ন্যায়, ছুঁড়ে দ্যায়
মায়াবি রাত্রির চূড়া থেকে
প্রজাপতি-কল্পনার ডানা থেকে
কুয়াশায়
নিরাশায়।
বুকের নিচের ঝড় বড়ই দারুণ,
বড়ই দারুণ।

শান্তনু-শ্যামলী

কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে পাশকরা বেকার সন্ত
শান্তনু ;
কপালে জ্ঞানের দ্যুতি ম্লান,
পকেট অপেক্ষাকৃত অনুদার,

অন্বেষা দুচোখে, কিন্তু প্রতিভার দাম কতটুকু ?
এইত সেদিনও ক্লাশে ‘ট্রাজেডি’ ‘কমেডি’ নিয়ে
কত তথ্য যুক্তিজাল বিছিয়েছে,
কফি হাউসের উষ্ণ টেবিলে তুলেছে ঝড়,
আরিস্ততল থেকে আনন্দবর্ধন
উদ্ধৃত করেছে অনর্গল ;
শিল্প আর জীবনের মাঝখানে কত সেতু কত ব্যবধান
খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব করেছে বিচার ;
“রচনাটি অনবদ্য”—বলেছেন প্রফেসর সেন ;
“অনবদ্য”—বলেছে শ্যামলী, লাইব্রেরির দোরে
মৃদু হেসে, ভ্যানিটি ব্যাগের স্ট্র্যাপে আঙুল বুলিয়ে,
“অনবদ্য লেখা।” ধন্যবাদ দিতে ভুলেছে শান্তনু,
বন্ধুরা ঈর্ষিত চোখে হেসেছে আড়ালে।
এইত সেদিনও

আজকে শান্তনু বড় ম্রিয়মান,
অন্য অ্যাক মলিন শান্তনু—
কলেজ স্ট্রিটের ফুটে পুরোনো মলাট-ছেঁড়া বই,
যতই ওলটাও পাতা ধুলো আর ধুলো
তার নিচে রেক্সিনের স্মৃতি, শুধু স্মৃতি।
গোলদিঘির জলে হয়ত সেদিনের কিছু কিছু ছায়া
অ্যাখনও মাছের মতো খ্যালা করে,
অ্যাখনও লিফ্টের মুখে হয়ত কাঁকন বাজে,
লাইব্রেরির দোরে
ভ্যানিটি ব্যাগের স্ট্র্যাপে হাত বুলায় কেউ—
অন্য হাত,
কোন রচনাকে কেউ বলে ‘চমত্কার!’—

অন্য কেউ।
শান্তনু অ্যাখন শুধু বেকার, তার
জিজ্ঞাসু দু-চোখে মাত্র একটি জিজ্ঞাসা :
"দয়া করে দেখবেন কি স্যার, যে কোনও বেতনে আপাতত…?"
নিরুত্তর আপাতত ; ভেংচি কাটে সুইংডোর জোড়া,
নিরুত্তর ক্রোচে, আজ নিরুত্তর সান্তায়ানা,
নন্দনতাত্ত্বিকদের গ্রন্থ থেকে যত্নে সংগৃহীত
দুরূহ-সুন্দর বাণী শান্তনু কি ভুলে গ্যাছে ?
শান্তনুকে ভুলেছে শ্যামলী ?
পুরোনো বইয়ের পোকা—শান্তনু—দেখছে চেয়ে
গ্রন্থভুক পাতায় পাতায়,
নায়কের ছবিটিকে অদ্ভুত দেখতে লাগছে কীট-দষ্ট,
আলপিনের কষ্ট সারামুখে।
শান্তনু মনস্ক হয়ে দ্যাখে,
দ্যাখে আর ভাবে।
কপালে জ্বরের তাপ, বাড়ি যেতে হবে,
সুপারিশ পত্র চাই ;
সারা গায়ে ব্যথা, য্যান দংশনে দংশনে ঝাঁঝরা
কীট-দষ্ট।
মনে পড়ে ক্লাশের মেয়েরা
বেঁধেছিল তিন-লাইন ছড়া—
"আহা মরি মরি
শান্তনু প্রতিভাবান্
শ্যামলী সুন্দরী !"

ইজেল ও বুনো পারাবত

আমিরালি অ্যাভেনুয়ে গুল্‌মোরের হলুদ ছড়ানো।
মুগ্ধ ছাতিমের ছায়া চকিত শালিখটিকে ছুঁতে চায়,
চকিত শালিখটিকে ফুটপাথের ধার ঘেঁষে ঘেঁষে
বারে বারে ছুঁতে চায়।
ট্রামের মর্মর বাজে বুল্‌ভারে,
ঘনশ্যাম ঘাসের ভেল্‌ভেটে
সহসা-বৃষ্টির দাগ লেগে থাকে অকারণ-স্নেহের মতন,
বুনো পারাবত ওড়ে নীল-কালো আকাশে, য্যান
ক্লান্ত শরীরের ছুটি সুইমিংপুলের স্থির জলে।

সেখানে তরুণ শিল্পী— আর্ট স্কুলের— অ্যাকলা ইজেল নিয়ে বসে,
ক্রিকেট-মাঠের তাঁবু
এই-রোদ-এই-ছায়া খ্যালা দ্যাখে ইজেলের গায়ে।
বুনো পারাবত ওড়ে
মুক্তির নীরব গান নীল-কালো আকাশে।
'দোতলা বাসের মধ্যে অ্যাকগাদা যাত্রীর ভিড়ে,'
মনে ভাবে তরুণ ছেলেটি,
'শান্তাদি কেমনধারা আরেক বন্ধুর সংগে—মানে সে বান্ধবী—
চেঁচিয়ে বলছিল তার পরীক্ষার কথা অনর্গল
এম’নি সময়ে কা’ল ছ-নম্বর নীল স্টেট বাসে

রাস্তায় বৃষ্টির জলে যখন
চমত্‌কার আলোছায়া ;
হাপুসনয়নকান্না স্টলের ক্যানভাসে
সমুদ্রের মতো থৈ থৈ—
ভবানিপুরের সিক্ত সুন্দর জুলাই।
শান্তাদি সুন্দরী নয়, তবু তার দেহের ভংগিতে
কোথায় কোথায় য্যান ভাস্কর্যের স্পষ্ট ছাপ আঁকা—
দৃঢ়-নমনীয় গ্রীবা, অবিকল কণ্ঠস্বর য্যান ছাঁচে ধরা,
স্নিগ্ধ নয়, শান্ত নয়, কর্কশও না মধুরও না,
নাচের ঘুঙুর যদি আরও চাপা হত,
ট্রামের মর্মর যদি ঘনশ্যাম ঘাসের ভেল্‌ভেটে
আরেকটু অস্পষ্ট হত, আরেকটু সংযত,
তাহলে অনেকটা য্যান শান্তাদির স্বর হত তারা।
রবীন্দ্রসংগীত গায় ক্যান যে শান্তাদি,
ক্যান যে বাংলা পড়ে এম-এ ক্লাসে,
ক্যান যে অ্যামন রোদে বৃষ্টিতে বর্ষায়
ইস্কুলের সামনে এসে না দাঁড়িয়ে
অনর্থক গল্প করে, নীল স্টেট বাসে, সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে
কে জানে ?...'

গুল্‌মোরের হলুদ ছড়ানো অ্যাভেনুয়ে
আর্ট স্কুলের তরুণ ছেলেটি
যতক্ষণ রোদ ছিল আকাশের ছাদে
দেখেছে দু-চোখ ভরে যতদূর চোখ যায়
বুনো পারাবত ওড়া—
শান্তাদির আত্মার মতন।

দেহি পদপল্লবম্

(বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে)

গিলে-করা পাঞ্জাবিকে পরিপক্ক নামাবলি শুধায় চকিতে,
‘কীর্তনীয়া হরিমতী শুনেছি আসবেন আজ,
জানেন কি কিছু ?’

শিঙের ছড়িটা ঠুকে চপেটার মতো য্যান মুখের ওপর
গিলে-করা বাবু বলে, ‘শুনেছি আসবেন, মানে ?
ওই তো দেখুন, ওই তো মৌচাক চোখের সামনে— হরিমতী,
আর এই আপনি আমি,
ভক্তিতে আপ্লুত সব মৌমাছিরা—মাপ করবেন—
বয়সের পরচুলোয় যতোই ঢাকুন আপনি
তৃষ্ণা সে তৃষ্ণাই,
আপনার আমার তৃষ্ণা—মেক-আপ আলাদা শুধু—
হরিমতী আসলে সে মধুমতী, আসলে সে গান, সুর,
সুন্দরী সে, তৃষ্ণার মুহূর্ত-শান্তি ।’

(বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে)

জলের কাঁকড়ার মতো শিরদাঁড়া বেঁকে
ভ্রূকুঞ্চ কপালে হাত নামাবলি বলে,

‘হরি হরি, এই সব অশ্লীল দুর্বাক্য মুখে…’
‘থামুন মশাই,
শুধুমাত্র শ্লীল দিয়ে হত না জীবন আর হত না যৌবন,
হত না এ হরিসভা,
আপনার আমার ভক্তি উবে যেত কবে।
অন্দরে মন্দিরে কোনও ইঁট ছাড়া ব্যবধান নেই ;
ভক্তি আর অনুরক্তি এপিঠ ওপিঠ
উভয়ই অশ্লীল।’

(বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে)

‘অশ্লীল ?’
‘আপনার মতে।
আমি বলি, উভয়েই শ্লীল।
মন্দিরে ইটের ফাঁকে যদি তৃষ্ণা থাকে, সেও শ্লীল ;
সংসারে অশ্লীল শুধু বিতৃষ্ণা, বিরাগ আর শূন্যভাণ্ড।
সত্যের তিলকধারী মিথ্যার সাধুতা—ভণ্ডামি,
আপনি আমি—অশ্লীল,
দুই ভণ্ড এপিঠ ওপিঠ।’

(বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে)

রেশমি নামাবলি দিয়ে পিঠের পাকানো দড়ি ঢেকে
বৃদ্ধ ছাখে গিলে-করা চল্লিশ বত্সর আগে নিজেকে চোখের সামনে
শিঙের ছড়ির মতো ঝক্‌ঝকে ক্ষুরধার জিভ।

(ঘটয় ভুজবন্ধনং জনয় রদখণ্ডনং
যেন বা ভবতি সুখজাতম্।)
দুজনেই ঘরে ফেরে দুজনেই মুখে
অ্যাকই সুর গুন্ গুন্ ভাজে—
ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্।
ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধনী
তত্র মম হৃদয়মতিযত্নম্।

মধুমান বনস্পতি

আমি অ্যাক ব্যূঢ় বনস্পতি
কোটি কোটি বৎসর প্রাচীন,
ফাটা-ফাটা গায়ে দ্যাখ বৃষ্টির ঝড়ের আর ধুলোর আঁচড়
আকাশের জলে ধোয়া রোদে-মোছা দেহ
পাখির কূজনে তৃপ্ত ঋতুতে ঋতুতে ;
জন্মের সুগূঢ় মন্ত্র শিকড়ের জটিল স্নায়ুতে ;
রূঢ় শিলাস্তর ফুঁড়ে মাটির সমুদ্রে খুঁজি তৃষ্ণার সান্ত্বনা।
কোন্ আদি বটবৃক্ষ মাটি থেকে উঠে ফের
ঝুরি দিয়ে ছুঁয়েছিল প্রথম মাটিকে ?
তারপর অসংখ অসংখ বাহু ক্রমাগত নেমেছে মাটিতে,
আকাশের দিকে ম্যালা সবুজ রাগিনী নিরন্তর
অন্তরায় সঞ্চারীতে গ্যাছে ফিরে ফিরে
কর্কশ সংগীত-মূঢ় পেচককে করেছে ভর্ৎসনা।

সেই আদি বৃক্ষ থেকে আমি অ্যাক বৃ্ঢ় বনস্পতি
নেমেছি সংসারে, দ্যাখ!
আমি অ্যাক নিরাশ্রয়, তবু
আমার আশ্রয়ে বাঁচে বসন্তবাহার পাখি,
দুপুরের শান্ত পারাবত,
শ্রাবণের মুগ্ধ জলে অর্পিত আবেগ
সহস্র শাখার কীট ; শিয়রে সন্ধ্যায়
অপূর্ণ চাঁদেরা ওঠে, অস্ত যায় নক্ষত্র অনেক।
ঝিল্লির ধ্বনির মধ্যে আবৃত বসুধা
গোপনে গোপনে ভরে সুধাভাণ্ড যৌবনমধুতে,
ঝড়ের সন্ধ্যায় দ্রুত বর্ষাতির মসৃণে আবৃত
দম্পতিরা—আতংকিত—খুঁজে পায় সহজ আশ্রয়
নিরাশ্রয় আমার ছায়ায়।
মধুমান বনস্পতি আমি
মাইকেলের সনেটে বন্দিত।
সূর্যের মৌচাক থেকে ক্ষরিত সুধায়
ভরেছি আ-পর্ণ শাখা শিরা উপশিরা।
এই মধু পরিপ্লুত সিন্ধুতে নদীতে,
ওষধির নিরীহ শরীরে—ধূলায়,
ফেনিল দুধের ভাণ্ডে, মাতৃস্তন্যে,
শিশুর মুখের আইসক্রিমে, দগ্ধ দ্বিপ্রহরে,
কফি-গন্ধি সন্ধ্যার টুংটাঙে
মুস্তাক-আলি-খাঁয়ের সেতারে,
বাখ-এর ছড়ের টানে সি-মেজরে।
রাত্রির মধুতে জন্মে মাংগলিক উষা
সুন্দর শিশিরখ্যাত মধুময়

ভৈঁরোর আলাপ য্যান নি-রে-সা-নি-সা-রে।
সূর্যের সগোত্র, বন্ধু মহাপ্রাণ
মধুমান বনস্পতি আমি
আরণ্যক কালের প্রার্থিত।

মহাদিগন্তের কবি

আমি য্যান কেউ নই, কিছু নই.
য্যান তবু প্রত্যেকের স্বর—
আমি সব সব-কিছু,
সভ্যতার নবজন্ম আমার স্নায়ুতে থরো থরো।
টেলিফোন-ভবনে আমি, অফিস-ক্যান্‌টিনে,
রক্তচূড়া গাছের ছায়ায়,
সমুদ্রের আর্দ্রতটে, অশোক কাননে।
বেহালা-করুণ ঘরে আমি স্মৃতি,
শিল্পীর ইজেলে ছায়া।
আমি য্যান রামায়ণে, মাইকেলের কাব্যের লাইনে,
আইনস্টাইনের সূত্রে, ক্রেসিডার চতুর আক্ষেপে, কিংবা
কালিদাস-রচিত নাট্যে নায়িকার ভর্ত্‌সনায়,
মহাশূন্যে গন্তুকাম রকেটের অগ্রভাগে আমি ;
মহাকালে অনন্ত স্পন্দন—আমারই বুকের ছন্দ,
আমারই চেতনা ;
আমি অগ্নি ত্রিভুবনে রূপে রূপে য্যান প্রতিরূপ।

কামনা-তৃপ্তির অ্যাক অতৃপ্ত কামনা বুকে নিয়ে
মহাদিগন্তের কবি আমি বসে আছি
সহস্র আলোক-বর্ষ আলোক-ত্বরিত রথে পার হব বলে
পরমাণু-উত্‌সারিত নবতেজে।
আমি চাই এই দেহে সহস্র বত্‌সর পরমায়ু,
চিল্কার-আশ্বিন-স্নিগ্ধ এই চোখে
নতুন দিগন্ত-দৃষ্টি—
স্বর্গ নয়, প্রসারিত মর্ত মৃত্যুহীন, বিজ্ঞানের ইন্দ্রজালে বাঁধা,
আইনস্টাইনের মন্ত্রে উজ্জীবিত—ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতো'য়মগ্নিঃ।

আমার অনন্ত বিত্ত এই চরাচরে ;
যদিও মিথিলা দগ্ধ তবু জানি পোড়েনি কিছুই।
আশাকে নিরাশা জেনে
পিংগলারা সুখে নিদ্রা যায়
আশার স্ফুলিংগ আমি দিগন্ত-দিশারি
জ্বালি নিরাশায়।
কামনায় ব্যাপ্ত এ সংসার
কামনায় ধৃত ধর্ম কামনায় সব কিছু বাঁধা
কামনার আত্মা য্যান
আদিগন্ত অলক্ত আকাশ।

অন্তহীন মহাকাল কামনার শাশ্বত আধার
জেগে থাকে য্যান তৃপ্তকাম
য্যান ধ্রুব নক্ষত্রের নিষ্পলক সাথি।
কালের সমুদ্রে জানি দ্বীপ নেই, নেই পারাপার,
সব কিছু নিয়ে ফের সব কিছু ফিরে দ্যায় কাল ;

আমার কণ্ঠের জ্বালা সেই কাল
সেই অম্বুনিধি।
অস্পর্শ তমসাবৃত শব্দহীন আদিম কালের
নিষ্প্রকম্প নিরাকাশে এসেছিল ভেসে
ঋতু মাস সংবত্‌সরে গ্রথিত সকাল—

সেই থেকে অন্ধকারে কাঁপে দ্যাখ আয়ুর তারকা,
মুহূর্তেরা বহুরূপী, হৃদয় হরিণ,
সেই থেকে ধূলিকণা দিগন্তের মেঘে
তৃষ্ণার করুণা চায়
রঙিন আবেগে !
আলো আর অন্ধকারে বোনা অ্যাক অনির্বাণ আলো—
যত্‌কিঞ্চ জগত্যাং জগত্‌
যস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি—
আকাশ, হৃদয়, মাটি, প্রাণ, ভালবাসা
অনন্ত মুক্তির মধ্যে স্পন্দমান
অনন্ত পিপাসা।

কলকাতা কলকাতা কলকাতা

স্বর্গ যদি কোথাও থাকে—আকাশে, মাটিতে, মাটির নিচে,
না, স্বর্গ কোথাও নেই, কিন্তু এখানে এই কলকাতায় রয়েছে
অংকুরিতা নারী যে কোথায় লতিয়ে উঠবে কেউ জানে না,
এবং নিষ্কোষিত পুরুষ, সাহসী, হন্তারক ;

আছে নয়নাভিরাম নিউ মারকেট এবং সন্ধ্যাশোভি বিপণির সার,
আর সোনালি মৌমাছিরা এবং তাদের মধুক্ষরা গুঞ্জরণ, এবং
যে-কোন গলিতে স্খলিত জ্যোতিষ, এবং টেবিলে জোড়া-
জোড়া তৃষ্ণা—
কলকাতা।

এখানে বসন্তের অন্য নাম মিউজিক কনফারেন্স,
শরত্—প্যান্ডেলে মাইকের প্রতিশ্রুতি,
বর্ষা—বাসস্ট্যান্ডের আবছায়া বা বার্ষতির স্বল্প পরিসরে
প্রথম আশ্লিষ্টসানু প্রেম, এবং
শীত—আপেল, কমলালেবু ও আঙুর।

না, স্বর্গ কোথাও নেই, কিন্তু এখানে রয়েছে
রক্তে ঝিঁঝিঁপোকার স্বর, স্বপ্নে ডায়ালটোন, এবং আয়নায় বিম্বিত
যাকে-ভাল-না-বেসে-বাঁচা-যায়-না সেই আমি-আমি-আমি ;
রয়েছে কবোষ্ণ নদী নিরবধি এবং উষ্ণ নারী দুরতিক্রম্যা,
আছে সদ্য যুবকের জন্য পার্ক ও রেস্তোরাঁ, সদ্য যুবতীর জন্য যুবক,
এবং উভয়ে জন্য শব্দের মৌচাকে তৈরি ভারতবিশ্রুত কফি হাউস।
না, স্বর্গ কোথাও নেই, কিন্তু এখানে আছে মাহ্-ভাদর গংগা,
জালে মসৃণ পেপারব্যাকের মতো রুপো-চিকচিকে ইলিশ, এবং
জলে য্যান পোনার ঝাঁক—অসংখ নৌকো, গাদাবোট, লন্চ,
দাম্ভিক সমুদ্রংগম জাহাজ এবং
হঠাত্ হঠাত্ তীব্র, মাদক উপসাগরের শিস—
কলকাতা।

এখানে কি আছে আর কি নেই ?
বালকের জন্য প্লানেটেরিআম, প্রাপ্তবয়স্কের জন্য সিনেমা,

এবং পলিত বৃদ্ধের জন্য ভাগবত,
বন্ধুর জন্য বন্ধুত্ব, তৃষ্ণার্তের জন্য পানীয়, আগন্তুকের জন্য রেশন কার্ড
আপনি বিদেশি ?   আপনি এখানে সুখে থাকবেন ;
আপনি বিদেশিনি ?   আপনিও।
যে-কোন চোখের জন্য কাজল, যে কোন পাইপের
জন্য টুব্যাকো—
এরই নাম কলকাতা।
এখানে কি নেই ?
নায়কের জন্য নায়িকা, এবং নায়িকার জন্য ইন্দ্রপুরী,
আবৃত্তির উপযোগী আধুনিক কবিতা, লঘু সুর তুলতে গিটার,
ছবির জন্য প্রদর্শনী এবং তারপর সহৃদয় সমালোচনা।
এখানে ইচ্ছার শেষ নেই, ঈপ্‌সিতও অনন্ত।
বহুনিন্দিত, অনিন্দ্য, এই শো-কেস-সুন্দরী শহরের নাম
কলকাতা।

এই শহর দিনে রাতে সবাইকে টানে।
লাভ দেখিয়ে, লোভ দেখিয়ে, লুকানো ইচ্ছার গায়ে হাত বুলিয়ে,
ব্যাংকের কাউন্টারে নোটের-বান্‌ডিল-শিকারি পিস্তল উঁচিয়ে,
নিলামঘরে হাতুড়ি ঠুকে, পথে নিয়নাভ চোখের চুম্বক দিয়ে,
কেবলই টানে।
টালায়, গড়িয়াহাটায়, ধনুকবাঁকা-ওভারব্রিজ ফ্রকপরা
মেয়েকে টানে ;
এবং উন্মাদিনী লরির চাকা অমনস্ক পান্থকে, মৃত্যু জীবনকে,
রোদ ছায়াকে, ট্রামগাড়ি অফিসগামিনীকে,
এবং কোল্‌ড ড্রিংক তৃষ্ণাকে টানে।

এখানে লেকের জল শান্ত এবং গভীর।
সেখানে ভাসমান শাদা বোট, অ্যাক ফালি জুলিএটের বুক, য্যান
কথা কয়ে উঠবে—
'এস রাত্রি, এস রোমিও, এস তুমি রাত্রির দিবাকর'।
ঘাসে, পাতায়, টেলিফোনের তারে কমলা রঙের সব জোনাকি,
মাটিতে স্ট্র ছড়ানো, এবং পাশে বাদামের খোসা ও আইসক্রিমের বাটি,
এবং খাসা ফুরফুরে হাওয়া।
যদি লেকে না এসে থাকেন তবে আপনি অ্যাখনও জন্মান নি।

স্বর্গ কোথাও নেই, কিন্তু এখানে
ময়দানে কে কবে পুঁতেছিল অ্যাক স্বর্গের মই—মনুমেণ্ট,
যার পায়ে মিটিং, গায়ে ঘোরানো সিঁড়ি, মাথায় ছয় ঋতু।
এখানে সারাদেশের ধিক্‌কার, রাগ, আহ্লাদ, সারা সংসারের
উত্তেজনা, মঞ্চে ওঠে ;
এবং মানুষের সমুদ্রের মধ্যে এই মেঘ-ছোঁয়া মই যখন লাইট হাউস
তখন ইতিহাস তৈরি হয়।
স্বর্গ যদি কোথাও—না, কোথাও নেই,
কিন্তু এই পৃথিবীর ভূগোলে, অন্তহীন আকাংখার অক্ষরেখায়, রয়েছে
গংগার মতো পুণ্যবতী, মনুমেন্টের মতো ঐতিহাসিক, দক্ষিণ হ্রদের
মতো সাহসিকা—
কলকাতা কলকাতা কলকাতা।

শেষ চড়ুইভাতি

তুমি আমার নাম ধরে ডাকলে, য্যান প্রথম,
এবং তখনই আমার হাতের পাঁচটা আঙুল
ঝনঝন করে উঠল,
তোমাকে গুলি করলাম।

তুমি অ্যাখন পালক-ছাড়ানো মোরগ, নিঃস্বর,
বালির ওপর তোবড়ানো মুখ,
এবং আমি, বাষ্পহীন চোখ, মুখোমুখি,
নিশপিশ-আঙুলে সদ্য-বারুদের ধোঁয়া।
তোমার ছুটি
আর আমার মনে আপাদমস্তক ভয়।

তা হলে
এই আমাদের শেষ চড়ুইভাতি।

বারুদের সমুদ্রে তোমার ভ্যালা ভাসিয়ে দিলাম।
তুমি জানতে, ভালবাসা অ্যাকদিন তোমাকে
ভূমিশয্যায় নিয়ে যাবে,
এবং আমাকেও।
কিন্তু পিকনিকের বিকেলে তুমি অ্যাকেবারে অবুঝ,
তোমার রক্তে বসন্তকাল এবং
হাতঘড়িতে ছোট কাঁটার ওপর বড় কাঁটা ;

তোমার অবুঝ পেশির মধ্যে আমি খরগোশের চেয়েও নরম ;
তুমি আমাকে হত্যায় বাধ্য করলে।
তুমি অ্যাখন স্থির, আমি অস্থির।

আমার জন্য ভেবো না,
আমায় শেষবারের মতো ভাবতে দাও।
বিশ্বাস কর, আমি খুব ভাল নেই।
মাথার ওপর কোন ছাদ আর নিরাপদ নয়,
এবং অ্যাখন সব গন্তব্যই পেছনে।
তুমি শান্ত, হয়ত সুখী,
আর আমার মনে আপাদমস্তক ভয়।

আঙুলের ফাঁক দিয়ে যদি পালাতে পারতে,
কি হত ?
তা হলেও আবার তুমি, আবার আমি।
কাল, পরশু, বা কোন পিকনিকের বিকেলে
তখন তোমার হাতে প্রতিহিংসু নিরিখ,
এবং আমি পাপীয়সী, মুখোশের মধ্যে আমার মন,
এবং মনের মধ্যে ছদ্মবেশ,
তুমি না পেয়ে, না পেয়ে, হাতড়াতে হাতড়াতে,
অবশেষে গুলি করতেই।
আমি তোমায় সে-সুযোগ থেকে রেহাই দিলাম।

তুমি অ্যাখন নেই ; জানি না, হয়ত আছ ;
কিন্তু আমার মনে আপাদমস্তক অশরীরি ভয়—
পাছে ভালবাসার কাছে ঘৃণা হার মানে
পাছে তোমার নাম ধরে ডেকে বসি !

জংশনে এসে

অ্যাতগুলি স্টেশন পার হতে হবে অ্যাখনও।
ঠিক কতগুলি? জানি না;
অথচ প্রত্যেক প্ল্যাটফর্মেই আমার পিপাসা,
এবং সময় রেললাইনের মতো দীর্ঘ।

কখন রওনা হয়েছি মনে নেই
অ্যাখন এই জংশনে এসে পথ ভুল হয়ে গ্যাছে;
অ্যাক গুচ্ছ আঙুর আমার ঠোঁটে টসটস করছে;
অ্যাতগুলি স্টেশন পার হতে হতে
যদি ভেঙে পড়ি, যদি ছিঁড়ে পড়ে।

আমাকে তুমি বুকের মধ্যে টেনে নিয়েছিলে.
আজ আমি তোমাকে বুকের মধ্যে নিতে চাই;
জংশনে এসে আমার সব ক্যামন গোলমাল হয়ে গ্যাছে
কেবল মৌমাছি আর মৌমাছি—
কেউ কোন হদিশ দিচ্ছে না।

আমার আঙুরগুলি নিয়েই আমি বিব্রত

পরিণতি

এই গংগাতীরের শপথ তুমি ভুলে যাবে,
এই লজ্জাবতী স্পর্শ আমি স্মরণ করতে পারব না ;
এই বনহংসীর মতো তুমি এবং দেবদূতের মতো আমি,
আমাদের মুখের অফুরন্ত আলো, বুকের বেহিশেবি আহ্লাদ-
সবই ।

তোমার শ্যাম্‌পুকরা চুলে আমার মুখ
এবং আমার বুকের মধ্যে প্রগাঢ় তোমার স্বর—
এই সবই আমরা ভুলে যাব ।

দেখিনা বৃক্ষ

দেখি না বৃক্ষ যা বৃক্ষকে অতিক্রম করে, নাম
অশ্বত্থ বকুল বট যাই হক, অথবা
কোকিল যে অতি-কোকিল, কিন্তু আমি
দিনের পর দিন ভিন্ন, আমার হৃত্‌পিণ্ডে
সেই চলিষ্ণু শব্দ, গতি, যা কেবলই কথা বলায়,
আমাকে দিয়ে অতিক্রম করায় আমার পিছিয়ে-পড়া ছায়া ।

আমি মাটির সরণি বেয়ে যেতে যেতে মনে মনে
মাটিকেই রূপান্তরিত করে নিই নক্ষত্রে।

দেখিনা পিপাসা যা পানপাত্রে অসুখী,
কিন্তু আমি হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মের পিপাসার পর পিপাসা লাফিয়ে
পানপাত্র ভেঙে চূর্ণ করে পিপাসাকে নিয়ে যাই সমুদ্রে।
দেখিনা সংগম যাতে বুকের জাঁতায় পিষ্ট হবার পরও
ভাজ্য যুবতী ভাজক যুবককে কোন উদ্বৃত্ত ভাগশেষ উপহার
দিতে পারে ;
কিন্তু আমার আলিংগন বাহুবন্ধনীকে উন্নীত করে আত্মার সংগমে!
আমার বিস্ময় আমাকে দাঁড় করিয়ে রাখে বিস্মিত আমারই চৌকাঠে।

দেখিনা বৃক্ষ যা বৃক্ষকে ভালবাসে, স্বর্ণলতা
যা স্বর্ণলতাকে ক্ষমা করে, অথবা নদী
যা বুকজোড়া মাছের কান্নায় কাঁদে ;
কিন্তু আমি আমার মধ্যে কেবলই বপন করি
নতুন নতুন শস্য—সুখের, দুঃখের।
অচেনা-আমির নিচতায় আমি নিচ হই,
আমার প্রতিবেশি দুঃখেরা আমায় চোখ বেঁধে
ঘানিতে ঘোরায়, এবং আমি ঘুরে মরি।

দেখিনা বৃক্ষ যা শ্রেণিবদল করে, এবং
ফোটায় অনভিপ্রেত ফুল দর্পে,
কোন দেবদারু ঝুরি নামায় মাটিতে
অশ্বত্থের মতো। কিন্তু আমি
শ্রেণিহীন আকাশের নিচে জন্মে
কেবলই শ্রেণিবদল করে চলি,

আমার বাঁহাতের উল্‌কি উঠে আসে ডান হাতে,
বাতাবিলেবুর ঘ্রাণ নিতে নিতে
তুলে নিই বুনো গোলাপ এবং অপ্‌সরা।

দেখিনা আয়না যা নিজেকে ভাঙে, আমি
আয়নার পরিবর্তে ভাঙি নিজেকে।
'অমুক অমুক' বলে ডাকি নিজেকে, য্যান
সনাক্ত করতে পারছিনা কিছুতেই, এবং
সরিয়ে রাখি নিজেকে পরিচয় থেকে অপরিচয়ে।

দেখিনা বৃক্ষ যা বৃক্ষকে, কিন্তু আমি
আমাকে পার হয়ে যাই অনায়াসে।

অস্ফুট বারুদ

গুলি করি, অস্ফুট বারুদ কথা বলে না, ম্রিয়মাণ আঙুল সন্ধ্যার
হলুদে অস্পষ্ট,
পেছনে অনেক অনেক শতাব্দী এবং অনিশ্চয় ঢেউ, হত্যাকারী
আমি, এবং
আমার রক্তাক্ত শব্দ অনুসরণ করে অনেক পদশব্দ, আর
শব্দের পেছনে উচ্ছিষ্টভুক অ্যাকপাল
গল্পখাদক শর্টহ্যাণ্ডপটু রিপোর্টার, আশ্চর্য!
অ্যাকটা বারুদগন্ধি শব্দ লুফে নেবার জন্য সারা সংসার উত্তেজিত।

গুলি করি, অস্ফুট বারুদ কথা বলে না,
কথা বলা তার স্বভাব নয়, তার স্বভাব হত্যা করা, স্তব্ধ করা।
সর্বশক্তিমান বারুদ য্যান ঈশ্বর, অ্যাক মুহূর্তে
ফুলের তোড়ার মতো উদ্ভাসিত মুখগুলি
ডিনার টেবিল থেকে উপড়ে এনে
শোকের সমুদ্রে ভাসিয়ে দ্যায়, ভাঙা মাস্তুলের টুকরো,
অসমাপ্ত প্রীতিভোজের মাঝখানে রোশনচৌকির সুরে বিষ
ঢেলে দিয়ে
সর্বনাশা টেলিগ্রামটি চোখের ওপর ছুঁড়ে মারে।

গুলি করি, অগ্নির মতো পবিত্র কি আছে আর ?
সেই অগ্নিদেবতার নামে উত্‌সর্গীকৃত এই আমার আগ্নেয়াস্ত্র।
অস্ত্র না আগ্নেয়গিরি ? যার উদ্গীরণে প্রাসাদ, পার্লামেন্ট,
পাঠশালা নিমেষে পম্পের ছাই ?
'অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্'—
হায় সুপথ ! যখন জগত্‌সংসার বিপথগামী, ওলটপালট,
তখন সুপথের অ্যাকমাত্র চালক তুমি, বারুদের ঈশ্বর।

গুলি করি, জীবনে এই প্রথম, যেহেতু
পেশাদার ঘাতক নই, কখনও হব না,
পবিত্র পুরোহিতের মতো—না খড়্গ নয়—অটোম্যাটিক গান হাতে
এই প্রথম মন্ত্রপূত জীবনকে টেনে নিয়ে গ্যাছি বেদিতে উত্‌সর্গ
করব বলে।

এই বেদি বানিয়েছি দীর্ঘ দশ বত্‌সর ধরে,
এই বেদি আমার মতবাদ, আমার ভবিষ্যত্‌ সমাজ, শতাব্দী ও
মনুষ্যত্বের সেতু—আমার বিশ্বাস।

অনেক গ্রন্থ ঘেঁটে, অনেক আপ্তবাক্যের বালুসিমেণ্ট মিশিয়ে
বানিয়েছি এই নিশ্ছিদ্র বিশ্বাস, তারপর
মন্ত্রপড়া জীবনকে, আমার সহচর বন্ধুকে, টেনে নিয়ে গ্যাছি বেদিতে
উত্‌সর্গ করব বলে !

আমি সিজারকে কম ভালবেসেছি তা নয়,
কিন্তু রোমকে ভালবেসেছি আরও বেশি,
আর সেইজন্যই পম্পের মূর্তির নিচে
আমার অটোম্যাটিক গানের তেত্রিশটি গুলিতে বিধ্বস্ত
রক্তাপ্লুত আমার বন্ধু।   আমি হত্যাকারী,
আমার পেছনে অনেক অনেক শতাব্দী, এবং অনিশ্চয় ঢেউ, এবং
আমার অপাপবিদ্ধ শব্দ অনুসরণ করে অনেক অনেক পদশব্দ।
ওদের বারণ করবার কেউ নেই, কারণ এই মুহূর্তে
আমার চোখ বারুদাচ্ছন্ন, কণ্ঠ বারুদাপ্লুত, এবং গোড়ালি
বারুদে প্রতিধ্বনিত।
আমি জানি না কে আমি, ক্যান আমি, আমার দুহাতে কার বাঘনখ,
আমি জানি না এই বিস্ফোরক মৃগনাভি
আমায় কোন্ অরণ্যে টেনে নিয়ে যাবে।

অস্ফুট বারুদ কথা বলে না, ম্রিয়মাণ আঙুল সন্ধ্যার হলুদে অস্পষ্ট,
পেছনে অনেক শতাব্দী এবং অনিশ্চয় ঢেউ, হত্যাকারী আমি, এবং
আমার রক্তাক্ত শব্দ অনুসরণ করে অনেক পদশব্দ।

ডায়াল টোন

ডায়াল করি দুবেলা রোজ কেলই রং নাম্বার,
বুকের মধ্যে বিরাম নেই ইচ্ছে শুধু জানবার
কি কথা ছিল চোখের কোণে—জল না শুধু ছল তার
স্টেশন ছুঁয়ে দাঁড়িয়েছিল যখন ট্রেন পলতার ?

সন্ধ্যাবেলা টেবিলে জাল এবং ছিল পিংপং
ফাঁড়িতে ছিল মমতাহীন প্রহরঘড়ি ডিংডং
অন্ধকারে জবাকুসুম দূরদিশারি সিগনাল—
আকাশে মেঘ হৃদয়াবেগ মেঘের মতো উত্তাল।

ব্যাড়ার গায়ে লজ্জাবতী নীলাভ লতা দরজায়
মাথার পরে আলুথালু শ্রাবণি মেঘ গরজায়
কাচের গায়ে সৃষ্টিছাড়া বিষ্টিজলের ঝিমকি
ফ্যান কি ছিল ঈষত্ খোলা, টেবিলল্যাম্প ‘ডিম’ কি ?

জানি না আমি, জানে না কেউ, জানে না সেও মন তার,
তবু তো ভাল লাগে আওয়াজ বেয়াড়া এই ফোনটার,
কি কথা ছিল চোখের কোণে—জল না শুধু ছল তার
স্টেশন ছুঁয়ে দাঁড়িয়েছিল যখন ট্রেন পলতার ?

আমাকে খোঁড়

আমাকে খোঁড় ওলটপালট কর
আমি তোমাকে শস্য দেব,
আমাকে মেঘ বিদ্যুত্‌ জলপ্রপাত দাও
আমি তোমাকে সন্তান তুলে দেব।

আমাকে আলিংগন দাও
আমি তোমাকে ভালবাসা দেব।

আমায় কষ্ট দাও
আমার ওপর তোমার সমস্ত পরিশ্রম রাখ
আমি তোমায় সাফল্য দেব, সুখ দেব।

আমার ওষ্ঠে
তোমার বিস্ফোরণ ঘটুক
আমি তোমার জন্য প্রাসাদ তুলে দেব কটিদেশে।

যদি আমাকে কাঁদাও
অ্যাকলা বসিয়ে রাখ বিরহিণী শ্রাবণে,
আমি তোমাকে অভিশাপ দেব না
তোমার জন্য একটি কান্নার কাঁথা সেলাই করব গোপনে।

আমাকে বুকে রাখ
আমি তোমাকে সুখে রাখব।

তখনও মন

এখানে মন ওখানে মন যেখানে নয় সেখানে মন
কখনও মন অশনিপাত স্তব্ধরাত সারাক্ষণ ;
যখন পথে বেরতে মানা আকাশে মেঘ বৃষ্টিকানা,
তখনও মন।

পিপাসা নাও খরা-আকাশ পিপাসা নাও ;
ওষ্ঠাগত পিষ্ট প্রাণ প্রত্যাঘাত ঘনায়মান
বোতামহীন ভাবনাভয় মেরুসমান,
যখন সুর নিরুদ্দেশ রাগিণী শুধু কণ্ঠক্লেশ,
তখনও মন।

পালকে মোড়া নরম বুক জোনাক-রাতে যখন সুখ
দ্যায় না, থামে নীলাভ কথা বিলীয়মান,
যখন পায়ে কেবলই দ্বিধা আকাশে তারা আলোকহীন
তখনও চোখ স্বপ্ন চায়,
তখনও মন।

আমি বিশ্বস্ত আছি এবং

আমি বিশ্বস্ত আছি, এবং থাকব।

রাতের খদ্যোত যখন অন্ধকারের বুটি
এবং ইউক্যালিপটাস গাছ নিষ্পলক,
যখন তৃষ্ণার সমুদ্র ধূসর
এবং পথ নির্জন,
যখন ঘরে বারান্দায় সিঁড়িতে
কোথাও কোন জবাবদিহি নেই,
তখনও
আমি বিশ্বস্তই থাকব।

এই আমার উত্তর, এই আমার শত্রুতা,
তোমার বিশ্বাসভংগের
এই আমার অ্যাকমাত্র জবাব।

তোমার কাছে প্রতিশ্রুতি ঠাণ্ডা পানীয়ের স্ট্র,
অ্যাক-দুই-তিন-চার-পাঁচ
দুমড়ে ছুঁড়ে ফেলতেই তোমার আনন্দ,
আমার সমর্পণকে অপমান করাই
তোমার খ্যালা।
আর ঠিক সেইজন্যই

যখন তৃষ্ণায় সমুদ্র ধূসর
এবং পথ নির্জন,
আমি তখনও বিশ্বস্ত।

তুমি বিশ্বাস ভাঙ বলেই
আমি বিশ্বাস রাখি,
এবং রাখব।

আমি বিশ্বস্ত আছি,
এবং থাকব।

তিন বানর ও এক গোয়ালিনী

আমার টেবিলে তিনটি বানর চন্দনকাঠে গড়া
কথা বলেনাকো, কানে শোনেনাকো, চোখে দ্যাখেনাকো তারা
আমার টেবিলে গোয়ালিনী অ্যাক কলসি মাথার পরে
বিশ্বনাথের গলিতে কিনেছি সওয়া দুটাকার দরে,
কেবলই তাকায়, চোখ বোজে নাকো, কেবলই দাঁড়িয়ে থাকে,
পায়ে চলা নেই, কথা মুখে নেই, অপলক দেখি তাকে।
চোখ কান বুঁজে মুখ ভ্যাংচায় তিনটি সত্যবাদী
য্যান বিচারক তিন ভুবনের, বাকি সব অপরাধী।
রেগে ফেটে পড়ে গর্বিনী মেয়ে বানরের অপমানে
বোঝে না তাদের দুই চোখ ঢেকে রূপ না দ্যাখার মানে।

তিনটি বানর চোখ বুজে ছাখে, মুখ বুজে কথা বলে,
গোয়ালিনী তার মাথায় কলস মেশানো দুধে ও জলে
আমার বন্ধু তিনটি বানর, বান্ধবী গোয়ালিনী—
সত্য-মিথ্যা, অরূপ-রূপসী, সংগী ও সংগিনী।

টিয়া পাখি

যাই, আসি,
হয়তো বলার কিছু থাকে—
বলি না।

দুপুরে শুকোয় চুল পিঠে
নত রোদ
(কে যে কার অনুগত)
ফুল ফোটে দক্ষিণ হাওয়ায়।
আসি, যাই,
হয়তো বলার কিছু থাকে—
বলি না।

দেখেও ছাখ না
বসে থাক,
হয়তো বলার কিছু থাকে—
বল না।

খাঁচার টিয়াটি বড় ভাল
ঠোঁট লাল
ফোলা ফোলা গাল,
দেখে থামি—
টিয়াই তো ?

কি যে তুমি, কি যে আমি,
(নেহাত্‌ই বোকামি)
কথাগুলি চুপ করে থাকে
বলি না, বল না।

সব করাঘাতগুলি

সব করাঘাতগুলি ঘরের ভেতর থেকে আসে ;
গেটে শেকলের শব্দ তাও য্যান গেটে নয় !
রাস্তার ওপার থেকে হাঁক দ্যায়, আমি জানি
ওপারে দাঁড়িয়ে নেই কোন ছায়া, সব কণ্ঠ বাড়ির ভেতরে,
এবং উঠোন তাও শয়নকক্ষেরই অ্যাকধারে,
অথবা নিকটে আরও ;   অ্যামনকি যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে
যুদ্ধ জিতে ফিরে দেখি স্বক্ষেত্রেই সকল বিজয়।

সব করাঘাতগুলি ঘরের ভেতর থেকে ওঠে,
জন্ম দ্যায় করতলে যা আমার করতলে ধৃত ;

অভিসারিকার বেশে জ্যোত্‌স্নার গুণ্ঠনে যারা আসে
তারাও ঘরেরই লোক, স্বপ্নের আকাশও চোখে পাতা—
যে-চোখ টেবিলল্যাম্প রাতভোর জ্বেলে বই পড়ে
এবং আড়ালে বয় আর অ্যাক চোখের মোমবাতি
যে-চোখের কিনারায় ইতস্তত নরম বকুল।

সব করাঘাতগুলি মনের ভেতর থেকে ওঠে।
মাঝধরা অন্ধকারে কৈশোরের ইন্দ্রনাথরাত
বর্ষার উদ্দাম খালে বারে বারে ফিরে ফিরে আসে ;
ঘুমের স্রোতের মধ্যে ঘাই মারে কোন অ্যাক রুই
নেহাত্‌ শর্ফরীভ্রমে যাহারে দিয়েছি ফেলে জলে—
মাঝরাতে মৎস্যপরী সে আমার পরিচিতা নারী
আমারই জালের মধ্যে জড়সড়, চিতানো দুপাশে খুব ভারি।

দেখেছি সকল স্রোত খুঁড়ে খুঁড়ে—প্রত্যেকেরই তলে চোরাবালি,
করতালিমুগ্ধ যারা হয়ত জানেনা তারা অ্যাক হাতে বাজে
সব তালি।

এরোড্রামে সকাল

মাটিতে আঁচড়িয়ে নখ
উড়ে যাবে পাখি
রোদের স্নোসেমরঙে অ্যাকজোড়া ডানা
হবে মাথামাথি।

চোখের বৃষ্টির দাগ
দুই গালে এঁকে
নেবে না বিদায় কেউ উড়িয়ে রুমাল
কারও কাছ থেকে।

আকাশ আশ্চর্য দেশ
সবই ছাড়াছাড়ি,
সরে যায় সিঁড়িগুলি সবুজ আলোয়
ফিরে যায় গাড়ি—
শুধু থাকে পাখি আর
পাখির সাঁতার
এবং দ্বীপের মতো কোন অ্যাক মনে
কারও মনোভার।

উঠোনে কুকুরটাকে ডাকে কেউ
‘লাকি লাকি লাকি’,
মাটিতে আঁচড়িয়ে নখ যেন অভিমানে
উড়ে যায় পাখি।

দ্বিতীয় নাম

আমার সেই কুমারী নাম তোমার করপুটে
সে-নাম নেই দ্বিতীয় এই নামের জটাজুটে
আমার সেই কুমারী নাম আমারই নাম
আমিই শুধু দ্বিতীয় কেউ ভুলে গেলাম।

আমার সেই কুমারী নাম রাখিনি নোটবুকে
সে-নাম কেউ দ্বিতীয় বার দ্যাখেনি আর ঝুঁকে
আমার সেই কুমারী নাম আমারই নাম
আমিই শুধু দ্বিতীয় কেউ ভুলে গেলাম।

শাওয়ার খুলে হঠাত্ ভুলে পুরোনো সুরে সুরে
গুনগুনিয়ে গুনগুনিয়ে গিয়েছি বহুদূরে,
আমার সেই কুমারী নাম আমারই নাম
আমি যে কোন দ্বিতীয় কেউ ভুলে গেলাম।

সকাল থেকে বাঁধিনি কেশ করিনি প্রাতরাশ
আমার চোখে রেখেছি ঢেকে আমার সর্বনাশ,
আমার সেই কুমারী নাম তোমারই নাম
তুমি যে কোন দ্বিতীয় কেউ ভুলে গেলাম।

শূন্য পুরাণ

অ্যাকটা শূন্যকে নিয়ে খুব বিপদে পড়ে গ্যাছি—
সামান্য অ্যাকটা শূন্য ভরাতে পারছি না।

শানাইঅলাকে দিয়ে নহবত বাজালাম
উপচে-পড়া রাগিণী শূন্যের পরিধি একটু ছুঁয়ে গ্যাল
কিন্তু শূন্যকে হঠাতে পারলাম না।

কি করি ?   আচ্ছা দাঁড়াও।
বাঁয়ে অ্যাকের পর অ্যাক সংখ্যা লিখে গেলে ক্যামন হয় ?
দশক, শতক, সহস্র, অযুত, লক্ষ, নিযুত, কোটি—
কি বিরাট অ্যাক সংখ্যা, য্যান অ্যাক দর্পিত সাম্রাজ্যের বাজেট !
মনে হচ্ছে এবার শূন্যকে খুব জব্দ করা গ্যাছে,
য্যান বড় করেই তার পায়ে বেড়ি দিয়েছি।

ওই সংখ্যার সমুদ্র থেকে ক্রমে বেরিয়ে এল
আকাশছোঁয়া বাড়ি, সমুদ্রকর্ষি জাহাজ,
গন্‌জ, দুর্গ, মন্দির, রংগমন্‌চ !
কিন্তু কি সর্বনাশ। প্রত্যেকের মধ্যেই অসংখ্য ফাঁক
আরও অসংখ্য শূন্য—
য্যান ছলনার মধ্যে ছলনা।
নাঃ
এবার কলমের অ্যাক আঁচড়ে
বাঁদিকের সংখ্যাগুলি সব ছেঁটে ফেলে
আবার সেই আদিম শূন্যটার মুখোমুখি হলাম।

এবার শূন্যের ডাইনে অ্যাকের পর অ্যাক
শূন্য লিখে ফেললে তো মন্দ হয় না
দশমিক, শতমিক, সহস্রমিক—
সংখ্যাটা ছোট হতে হতে অ্যাকেবারে অণুবীক্ষণের রেন্‌জ
পেরিয়ে যাচ্ছে।
বাঃ বেশ তো !
এবার শূন্যকে খুব সরু বোতলে ভরে জব্দ করা গ্যাছে
এই ভেবে বেশ তৃপ্তি হচ্ছিল,
কিন্তু হঠাৎ অ্যাক প্রচণ্ড শব্দে তৃপ্তির বোতল ভেঙে চুরমার।

অদৃশ্যপ্রায় সংখ্যার মতো অদৃশ্যতর শূন্যটা
পারমাণবিক বিস্ফোরণে গর্জে উঠল—
দেখি, সংখ্যার শরশয্যায় পিতামহ শূন্য শুয়ে আছেন
তাঁকে নড়ানো যাচ্ছে না।

অ্যাকটা শূন্যকে নিয়ে খুবই বিপদে পড়ে গ্যাছি।

দেবদূতেরা

দেবদূতেরা তেমনি আজও বহুরূপী
তেমনি আজও মর্তে নামেন চুপিচুপি ;
দেবদূতেরা আজও আছেন স্পষ্ট জানি,
তেমনি আছে হঠাত্‌-শ্রুত দৈববাণী।

দেবদূতেরা মনোলোভন হঠাত্‌ আসেন
ভালবাসার আগেই তাঁরা ভালবাসেন,
হাতের তুলি কাড়েন তাঁরা ছড়ান মোহ
কণ্ঠে দোলান মুগ্ধ সুরের সমারোহ।

ঝরনা করে কবিতা পাঠ, এরোপ্লেনে
শব্দ বাজে মহাকাশের, রাতের ট্রেনে
সহস্রাক্ষ সহস্রপাদ দেবদূতেরা
স্বপ্ন হয়ে স্বপ্নে করেন চলাফেরা।

রক্তে নামেন, রাত্রে ডাকেন নতুন নামে,
পত্র লেখেন সাংকেতিকে রঙিন খামে,
গল্পে এসে বসেন তাঁরা সমস্ত ক্ষণ
আদায় করেন সমস্ত সুখ সমস্ত মন।

কে বলে নেই দৈববাণী আকাশে আর,
কে বলে নেই ?   কেরলবাগে শকুন্তলার
বুকের মধ্যে রথের চাকা কে বলে নেই ?
আকাশ এবং আকাশবাণী রয়েছে সেই।

যখন চোখে জ্বলে কোমল মোমের বাতি
বৃষ্টি-কাজল মেঘের নিচে কাজলরাতি,
মনকে টানে দূরের আকাশ, তখন তাঁরা
আবহগান সৃষ্টি করেন তোলেন সাড়া।

ব্রিজে কিংবা ওভারব্রিজে কিংবা লেকে
ঘূর্ণী ওঠে ঝরাপাতার কালবোশেখে ;
রক্তে নামেন, তিথ্‌ন আলোয় দৃষ্টি ঢাকেন
দেবদূতেরা বুকের কাছে স্পর্শ রাখেন।

দেবদূতেরা হঠাত্‌ আসেন, যখন দুয়ার
ঝড়কে ঠ্যালে দুহাত দিয়ে অসংখ্যবার,
যখন দেহে বুনো-গোলাপ শ্রাবণ-নদী
তখন তাঁরা দেহের মধ্যে নিরবধি।

নিথর রাতে নিদ্রাবিহীন জ্বলে নিয়ন
স্বপ্নাতুরার বুকে গভীর অ্যাকর্ডিয়ন

আপনি বাজে, তখন দূরের দেবদূতেরা
গানের মধ্যে প্রাণের মধ্যে বাঁধেন ডেরা।

আমাদের এই স্নায়ুর মধ্যে, চোখের দ্যাখায়,
মর্মরে বা চিত্রপটে কিংবা লেখায়
দেবদূতেরা আছেন বলেই কাছাকাছি
স্বপ্ন আছে, সত্য আছে, আমরা আছি।

জননী বাংলা

ভূগোলের বইটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, মানচিত্রে বিরক্ত আমি
সোজা তোমার নীলাকাশি মুখের দিকে তাকালাম ;
তুমি আমার মাটিময়ী বাংলা মা, আমি তোমার সন্তান,
আমাদের মাঝখানে দোভাষিরা ভিড় কোরোনা, দরকার নেই

রবীন্দ্রসংগীত-প্রতিফলিত শ্রাবণ
অজস্র-মেঘলা-বাট-থেকে-দুধ-দোয়ানো বৃষ্টি
এরই মধ্যে আমি জন্মেছি, এই আমার বাংলাদেশ,
এই জরিপাড়-রোদ-মোড়া দিন, এই স্বপ্নবাসবদত্তা-রাত,
এই আমার বাংলা—
আমার দেশজননী।

পৃথিবীর সমস্ত আবেগ দ্রবীভূত করে
মাটির সোঁদা গন্ধে ভরপুর 'পথের পাঁচালি' তোমার রামায়ণ,

লালমাটির 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা' তোমার মহাভারত,
এবং সাত রাজার ধন 'পদ্মানদীর মাঝি' তোমার শতাব্দীর শাহ্‌নামা ;
তুমি আমাদের রূপকথা, পুরাণ, ইতিহাস ; তুমি আমাদের জয়স্তম্ভ।

বাংলা মাটির প্রলেপ—উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ—আমার সারা গায়ে,
কপালে দুপুর-দগ্ধ প্রাচীন তাম্রলিপি ;
আমার বুকের মধ্যে যে গাঢ় তরমুজের আবেগ, চোখে উড়ন্ত গাঙশালিখ,
স্বপ্নের মধ্যে অ্যামপ্লিফায়ারে ভাটিয়ালি—
এরা সবই তোমার নদীর চর, আকাশ, জলস্রোত থেকে
সোজা আমার মধ্যে উঠে এসেছে।
জননী বাংলা, তোমার চিত্রা কপোতাক্ষ নবগংগার স্রোত আমার রক্তে,
আমার জন্মের শিকড় তোমার ইতিহাসের মধ্যে নিবিড়,
তুমি আমার স্নিগ্ধ-শ্যাম, রুদ্র-উত্তাল, নদী-প্রতিমা মা।

তোমার বাগানে অ্যাত সৌরভ, ফলে অ্যাত স্বাদ,
তোমার উঠোনে উত্‌কণ্ঠিত রোদ—য্যান ভাইবোনের চোখ—অ্যামন আকুল,
রক্তাভ ঈশান কোণে ঝড়ের অ্যাত দর্প,
কিষাণের বুক অ্যাত সাহসী, তরুণের পেশী অ্যাত আদর্শপরায়ণ,
তুমি আমাদের সকলের জন্মদাত্রী, ধাত্রী, জন্মভূমি।

বিবাদ-বিসংবাদ, হত্যা-আত্মহত্যা, ঈর্ষা-কলহ সব শেষ হলে
আমরা বাংলার ভাইবোনেরা ঈশ্বরের কাছে, আল্লার কাছে, নতজানু
আবার মুখ ফেরাই তোমার অভিমানিনী পদ্মাবতী ভাগীরথী মুখের দিকে।

অন্ধকার যখন আলো দ্যায়না, পথ দ্যাখায় না,
তোমার দুগ্ধবতী গায়ে অন্ধের মতো আঘাত করি,
তুমি কথা বল না, দুয়োরানি-রাত কাটাও যন্ত্রণায়,
আমাদের নবান্নের দিন এমনি করে আমরা পিছিয়ে দিই ;
কিন্তু তুমি আমাদের সর্বংসহা জননী আশাবাদিনী।

ভূগোলে বা মানচিত্রে তুমি আছ কি নেই জানি না,
শুধু জানি তোমার নীলাকাশি মুখ আমার মুখের ওপর,
আমার স্বপ্নজাগরণ জন্মমৃত্যুর ওপর তোমার মুখের আলো,
আমার ইতিহাস তোমার ইতিহাসের পটে চিত্রিত,
তুমি আমার বাংলা, আমার দেশজননী মা।

কয়েকটিমাত্র নদী

কয়েকটিমাত্র নদী আমি পার হয়েছি—
কোনটি সবে পাহাড় থেকে অংকুরিত, কোনটির
গায়ে বর্ষার ঢল, কোনটিতে
কোটালের বান ডেকেছে কূল ছাপিয়ে, কেউ বা
পৌঁছেছে মোহানায় সংগমে।

নামগুলিও খুব সুন্দর
রেবা, শিপ্রা, মন্দাকিনী, মধুমতী
য্যান নামের মধ্যেই অ্যাকঅ্যাকটা আবেগ খ্যালা করছে

অ্যাকঅ্যাকটা নদী অ্যাকঅ্যাকটা অভিজ্ঞতা—
কোনটি ক্ষীণা পার হতে হয় হেঁটে
কোনটি ছলাত্‌ছলা পেরতে হয় সাঁতরিয়ে,
কখনও শরণ নেবে খেয়ানৌকার, কখনও লন্‌চের।
কিন্তু জোয়ারই হক আর ভাঁটাই হক
হক শুকনো অথবা খরা
হাবুডুবু খাবেই, কারণ
নদীমাত্রেই—অ্যামনকি ফল্গুও—স্রোতস্বতী, আর
না ডুবে কোন নদীকেই নদী বলে চেনা যায় না।
কোনও নারীকেও না।

কয়েকটিমাত্র নদীতে আমি ডুব দিয়েছি
কোনটিতে স্নানের জন্য, কোনটিতে বা
আংটির তল্লাশে।
যে যাই বলুক নদীতে ডুব দিয়ে সুখ আছে।

কয়েকটিমাত্র নদী আমি মেপে দেখেছি—
নিশ্চয়ই আরও নদী আছে—
কোনও নদীরই তল পাইনি।
বোধ হয় কোনও নদীরই তল নেই।

সব রকমের নদীতে নেমে দেখেছি
সব নদীতেই নামা যায়,
এবং যখনই নামবে তখনই নামার ঋতু ;
কিন্তু কোনও নদীই নেমে ফুরোনো যায় না।

তবু নদী মাত্রেই নাব্য, এবং
নাবিকের কথা যদি মান,
নদীমাত্রেই সুপেয়
যদি তৃষ্ণা থাকে।

তাছাড়া, সব নদীই খুব টানে।
আর দূর থেকেই হক বা খুব কাছ থেকেই হক
কখনও না কখনও নামতেই হয়।
শুধু মনে রেখ, সব নদীই বাঁকা
কেউই সোজা সমুদ্রে যাবে না।

দরজা

যখনই কোন দরজা থেকে ফিরে আসি
আরেকটু শিক্ষিত হই, আরেকটু অভিজ্ঞ, বুঝি
গৃহ মানেই দরজা এবং দরজা মানেই
গৃহশিক্ষক।

অ্যামন কেউ নেই
যাকে কখনও কোনদিন
দরজায় দাঁড়াতে হয়নি।
দরজামাত্রেই অলৌকিক,
দরজায় পদ্ম এবং বার্নিশকরা সরোবর
সেখানে ফলিত তোমার প্রতিবিম্ব
তুমি সেখানে আগন্তুক রাজপুত্র
কারণ তুমি জান না কে কখন দরজা খুলবে।

পৃথিবীর সব মানুষের ভাগ্য স্থির হয়
দরজায়।
দরজার চৌকাঠে কষা হতে থাকে
কঠিন হিসাবনিকাশ, আর
পাপোশে জুতো ঘষতে ঘষতে
মনে হয় চকমকি ঠুকছি, অবশ্য
সব ঘর্ষণেই স্ফুলিংগ জ্বলে না।

কোন কোন চৌকাঠ অ্যাকেবারেই কাঠ,
য্যামন কোন কোন সন্ধ্যা
অ্যাকেবারেই অন্ধকার
কখনও কখনও দরজায় প্রতিটি টোকাই
হয় রোমান্‌স নয় রূপকথা
এবং প্রতিটি কড়ানাড়া
য্যান স্বাধিকার ঘোষণা এবং
প্রবেশমাত্রেই আবিষ্কার ও জয়।

দরজা বাদ দাও
ঘরের আর কিছুই থাকবে না।
কখনও কখনও দরজা দিতে হয়
কিন্তু কখনই বাদ দিতে নেই।

দরজা অলৌকিক। ভেবে ছাখো,
পৃথিবীর সব পথই
দরজায় দাঁড়িয়ে আছে—
এবং সব মানুষ।

আত্মহত্যার পর

আত্মহত্যার পরও
কিছু কিছু সুখ অবশিষ্ট থাকে, বেশ কিছু,
চিবোনো আখের ছিবড়ের মধ্যে য্যামন কিছু শর্করা
যার চারপাশে পরিশ্রমী পিপীলিকার সারি।

থাকে সমুদ্র এবং সমুদ্রতীর
এবং মাছধরা জাল, এবং দেহকে তুলে এনে
তার ওপর ছিটিয়ে দেবার জন্য অনেক নুন—
বুঝি দেহের স্বাদ এবং সাধ থেকেই
জন্ম ন্যায় আত্মা।

থাকে ঢেউয়ের ঝুঁটি ধরে ধূসর পাখির ঝাঁক,
শব থেকে নিষ্কাশিত মৃত্যুহীন আয়ু,
এবং আকাংখা উড়িয়ে দেবার জন্য
পাখির ডানায় গোধূলিময় শব্দ।

থাকে শেষ বিস্ফোরণের শব্দ
কোন ওষ্ঠে, প্রতিধ্বনিত
কোন প্রিয়তম নাম স্বপ্নে
বাকি পৃথিবীকে শুদ্ধ রাখবার জন্য।

বেশ কিছু থাকে—
আত্মহত্যার পরও থেকেই যায়।

সে, বৃক্ষ এবং আমি

জানলা দিয়ে বাগানের দিকে তাকালাম
দেখি জানলার ওপারে সে দাঁড়িয়ে আছে
প্রত্যক্ষ, তখন দেয়ালঘড়িতে মধ্যরাত
এবং আকাশের চূড়ায় জ্বলজ্বল করছে কালপুরুষ
আমার দুর্বোধ্য জিজ্ঞাসাগুলির ওপর
তার হাত প্রশাখার মত ছড়ানো,
পৃথিবীর শিকড়ে অ্যামন কোন মধু বা ধাতু নেই
যা তার অনায়ত্ত, আমার বাগানের মাথায়
দুর্গাপ্রতিমা-আকাশ, নক্ষত্রের পট জরিমোড়া,
নিচে ঝিঁঝিপোকার জংগলে
বৃক্ষের নাম ধারণ করে সে দাঁড়িয়ে—
য্যান আমিই।

শেষ রাতে বাগান থেকে দারুভূত আমি
জানলা দিয়ে ভেতরে তাকালাম
দেখি ঘরের মধ্যে সে শুয়ে আছে
স্পষ্ট, যদিও কুয়াশায় চরাচর আচ্ছন্ন
এবং পৃথিবীর রহস্যগুলি সর্বত্র সজীব ;
মমতাময়ী সিঁড়ি উঠে গ্যাছে চিলেকোঠায়
এবং একটি বন-জোনাকি নক্ষত্র হয়ে ফুটে আছে শিয়রে,
এবং ঘরের মধ্যে মিথুন রাশির মতো জোড়া খাট, মেঝেয়
আকাংখার সলতে উসকানো, সেখানে বসবাস করছে
আমার নাম ধারণ করে সে—
য্যান আমিই।

জলস্রোতে বিম্বোষ্ঠ

জলে পড়ে থাক আমার ছায়া অথবা ভেসে যাক
আমি তৃষ্ণাকে গলায় কণ্ঠির মত বেঁধে
বাকি-আমিকে নিয়ে চলে যাব আঘাটায়—আমার স্বদেশে।
কাঁটাঝোপের মধ্যে কোন অন্ধকার পাখি যদি সম্ভাষণ করে ওঠে
প্রতি-সম্ভাষণের বদলে আমি ভাসতে ভাসতে ভেসেই যাব।

জলে পড়ে থাক আমার ছায়া অথবা ভেসে যাক
যদি বাকি-আমিকে কোন অ্যাক উঠোনে পৌঁছে দিতে পারি।
জানি আমার অভিসন্ধি নিয়ে প্রশ্ন উঠবে ঢের
নিশ্চিহ্ন আমাকে নিয়ে মাথা ঘামাবে অনেকেই
উত্‌সাহিরা সনাক্ত করতে চাইবে আমার গোপন দুর্বলতা
আর আমি তো জানি আমার দুর্বলতাগুলি কত দুর্বল,
কিন্তু যে-আমির জন্য কারও মন পুড়েছিল
যে-আমিতে কারও কারও মন পড়ে ছিল
আমার দায় তাকে নিয়েই, এবং যদি পারি
সেই-আমিকেই পৌঁছে দেব কোন অ্যাক উঠোনে।

জলে পড়ে থাক আমার ছায়া অথবা ভেসে যাক
বাকি-আমিকে গ্রীষ্মের মধ্যে ফেলে রাখব দাহক বালুতে।
হৃদয়হীন জল শুধু ভাসবে এবং ভাসাবে
তৃষ্ণার ফাঁস খুলে দেবে না গলা থেকে কিছুতেই।

‘স্রোতের কাছে এসেছিলাম, ফিরে যাচ্ছি’, এই কথা বলে
জলের কাছে বাঁধা রাখব আমার ছায়া ;
থাক বা ভেসে যাক, ভিজুক বা গলুক,
বাকি-আমিকে নিয়ে চলে যাব আঘাটায়—আমার স্বদেশে।

জলে পড়ে থাক আমার ছায়া অথবা ভেসে যাক
বাকি-আমিকে নিয়ে পাড়ি দেব অ্যাকা,
তৃষ্ণাকে গলার কণ্ঠি করে চলে যাব ভিসা ফুরোবার আগেই
অমাবস্যা পাখি যদি ঘাপটি মেরে থাকে থাকুক
কন্টিকারির বনে সেজন্য ঝড় তুলব না।
একটি উঠোন আমায় ডেকে নিয়ে যাবে রৌদ্রাভ অপরাহ্নে
এবং তখন যদি কেউ প্রশ্ন তোলে তুলুক
নিরুত্তর আমি গ্রাহ্য করব না।
জলে পড়ে আছে আমার ছায়া অথবা ভেসে গ্যাছে।

জলে পড়ে থাক আমার ছায়া অথবা ভেসে যাক
সময়ের মধ্যে শায়িত দিনগুলি জেগে উঠুক বা কথা বলুক
মাখনের মধ্যে ছুরি বিঁধুক এবং বেরিয়ে আসুক বারে বারে
কব্‌জির মধ্যে নিশপিশ করুক ক্রোধ অথবা জুড়োক
অরণ্যের মাথায় অগ্নিবৃষ্টি করুক মে-মাসের রক্তচূড়া ;
যে-কথাগুলি স্বপ্ন থেকে উঠে এসেছিল য্যান জলস্রোতে বিম্বোষ্ঠ
এবং দিয়েছিল মধু, মর্যাদা এবং মোহ,
যে-দুঃখী মুখগুলি এঁটে বসেছিল আমার গরিব মুখের মধ্যে
তাদেরই স্বার্থে আমি ভেসে যাব ভ্রূক্ষেপহীন—
দিন বড় হক বা রাত বড় হক
জলে পড়ে থাক আমার ছায়া অথবা ভেসে যাক।

প্রত্যাবর্তন

তুমি যাবার সময় অ্যামন অ্যাকটা ভান করলে
য্যান সত্যিই চলে যাচ্ছ।
সেই বিশ্রি বিদায়-নেবার শেষ রাতে
জারুলগাছের পাতাগুলিকে তুমি তাই বুঝিয়েছিলে,
উঠোনের ধুলো এবং ঝরা ফুলগুলিও তাই বুঝেছিল—
য্যান আর ফিরবে না, ফিরবে না, ফিরবে না
কোনদিনই না।

নিভন্ত চোখে কান্নার কাচ বসিয়ে য্যান বলে গ্যালে—
‘এর পেছনে কোন পারা নেই, অতএব
সামনে কোন মুখচ্ছায়ার সম্ভাবনাও রইল না।
তোমরা যারা পড়ে রইলে আমার অগোচরেই রইলে,
আর আমি রইলাম শূন্যের মধ্যে শূন্য সর্বশূন্য।’

আমি সত্যিই তোমার চাতুরি তখন ধরতে পারিনি
সেই বিশ্রি বিমর্ষ শেষ রাতে তোমার চলে যাওয়া
আসলে যে অ্যাকটা ভান ভাবতেই পারিনি।
য্যামন অফিসে গিয়ে হঠাত্‌ দুপুরে অ্যাক অ্যাকদিন
নানা ছুতোয় ফিরে আসতে (সত্যিই ক্যান আসতে ?)
ত্যামন কোন মতলব ভাজনি তো ;
পলকের জন্য অ্যাকবার এ-কথাটা মনে হয়েছিল ;

কিন্তু আমি তো তোমার মতো সন্দিগ্ধ বা অবিশ্বাসী নই
তাই ধরেই নিয়েছিলাম তুমি চিরদিনের জন্যই চলে গিয়েছ।
কিন্তু অ্যাখন স্পষ্ট অনুভব করছি
তুমি পা টিপে টিপে ফিরে এসেছ
উঠোনে দাঁড়িয়ে ভিজছ হাপুস-নয়ন বর্ষায়,
কিন্তু কেউ দরজা খুলছে না, কারণ
কেউ তোমাকে দেখতে পাচ্ছে না,
আমিও না।

তুমি অশরীরী তাই কলিংবেলে কোন আওয়াজ তুলতে পারছ না।
তোমার কষ্ট আমি বুঝতে পারছি।
নিজেকে লুকোতে গিয়ে খুব জব্দ হয়ে গিয়েছ, তাই না ?
তুমি জানতে না, কত বড় অ্যাকটা রিস্‌ক নিয়ে
এই লুকোচুরি খেলতে গিয়েছিলে।
কিন্তু অ্যাকবার খেলায় নেমে তো আর ফিরে আসা যায় না,
সব খেলারই কিছু কিছু নিয়মকানুন আছে
এবং সেগুলি মানতে হয়।
তোমার জন্য সত্যিই আমার কষ্ট হচ্ছে।

কাল রবিবার
দেয়াল-ঘড়িতে দম দিতে হবে
অত উঁচুতে কে উঠবে তুমি ছাড়া ?   কাজেই
তোমাকে আসতেই হবে, এসে উঁচু টুলের ওপর অ্যাকবার দাঁড়াবেই
কারণ এটাই তোমার চিরদিনের অভ্যাস।
অথচ আমরা কেউ তোমায় দেখতে পাব না, এবং
ঘড়ির স্প্রিং একটুও নড়বে না, কারণ

তোমার দেহে অ্যাখন মাংসপেশি নেই, তাছাড়া
তোমার দেহটাই তো নেই।

ধরলাম তুমি সত্যিই চলে গ্যাছ
চিরদিনের জন্য চলে গ্যাছ।
কিন্তু আমার ঘুমের মধ্যে, স্বপ্নের মধ্যে তো
অ্যাখনও অবিকল তেমনই রয়েছ।
আমার শেষরাতের জানলায় ঠান্ডা হাওয়া
আমার ভিজে বালিশের নোনতা স্বাদ, এবং
রাইটিং প্যাডের ওপর অমনস্ক
মন-ক্যামন-করা শব্দের পর শব্দ—
এগুলি যতদিন আছে ততদিন আমার কাছে
তোমার চলে যাওয়া অ্যাকটা ভান ছাড়া আর কি ?

আমি স্পষ্ট অনুভব করছি
তুমি পা টিপে টিপে ফিরে এসেছ
উঠোনে দাঁড়িয়ে ভিজছ হাপুস-নয়ন বর্ষায়
তোমার কষ্ট হচ্ছে, কষ্ট আমারও হচ্ছে,
কিন্তু তবু ক্যান আমি দরজা খুলতে পারছি না ?

শেষ প্রতিকৃতি

তোমার শেষ প্রতিকৃতি
দেয়াল থেকে উপড়ে মাটিতে আছড়ে ফেললাম।
পিতামহ, তুমি কি কিছু মনে করলে ?
করলেও আমি নাচার।

তোমার প্রতিকৃতি চুরমার হল
এটা আশ্চর্য নয়,
অ্যাতদিন পরে হল এটাই আশ্চর্য।

নোনাধরা দেয়াল থেকে ঝুরঝুর করে বালি খসে পড়ছে
ছাদের কড়িকাঠে উইয়েরা সুড়ংগ বানিয়ে
গেরিলা যুদ্ধের মহড়া দিচ্ছে
পালংকের ভেতরটা ঘুণধরা ঝাঁঝরা
অথচ তৈলচিত্রিত তুমি এসবের মধ্যে
দেয়ালের গায়ে অ্যাতকাল
দর্পনারায়ণ হয়ে টিকে ছিলে, আশ্চর্য!

তোমার একটুও লজ্জা করেনি?
তোমার দেয়ালের মোহ
অবিকল মন্ত্রিদের গদির মোহের মতো,
টেনে না নামালে তোমরা নামতে জান না।
অতএব, পিতামহ, রাগ কোর না,
করলেও আমি নাচার।
তোমার যা প্রাপ্য তাই তোমাকে দিয়েছি।
অ্যাথন সময় খুব খারাপ
কেউ কারও ধার ধারে না।
তোমাদের সেকাল অ্যাথন আর নেই।

তোমায় খুবই অপমান করতে পারতাম,
বাস্তবিক তোমার হামবড়া ভাব দেখে
আপাদমস্তক রি-রি করত

এবং জিভের ডগায়, কি বলব মাইরি,
তোমরা যাকে অ্যাক কথায় বল স্ল্যাং,
কিন্তু ছ্যাখ আমি মুখ খারাপ করিনি, অপমান করিনি,
শুধু জুতোর গোড়ালি দিয়ে পোর্ট্রেটটি মাড়িয়ে দিয়েছি।
বেশ করেছি।
এটুকু অন্তত তোমাকে সহ্য করতেই হবে।

কি বললে? দেয়ালে অ্যাখন কার ছবি টাঙাব?
কার আবার? আমার, আমাদের।
ওকি, তুমি অমন ভাঙা কাচের মত
ঝনঝন করে হেসে উঠলে যে?
কি বলছ? আমার দশাও তোমার মতোই হবে?
তোমার পোর্ট্রেটের মতো?
লাথি খাবো, ভেঙে চুরমার হব?
অর্থাত্ বলতে চাও, তুমি আমি সব শ্লাই সমান?
মানি, খুব ন্যায্য কথা,
কিন্তু ফিল্জফি রাখ।

পিতামহ, এবার অ্যাকটা কাজের কথা বলি, শোন।
কিন্তু একি তুমি অ্যামন চুপ মেরে গেলে ক্যান?
ওঃ, তুমি দেখছি অ্যাতক্ষণে সত্যিই টেঁসে গিয়েছ!
যাক গে, গুলি মার, অ্যাখন দেয়ালটায় সত্যিই কিছু করা দরকার।
কিন্তু ফ্যাংকলি বলছি, দাদু, ভয় করছে,
ওই দেয়ালে উঠতে ক্যামন গা কাঁপছে
কেবলই মনে হচ্ছে নিচু থেকে লাথি মারবার জন্য
কে বা কারা য্যান তৈরি হচ্ছে,
কে? পিতামহ তুমিই নাকি?

আমি য্যান নিজেই নিজেকে ফ্রেমে আটকে
গায়ের ওপর তেলরঙ লাগাচ্ছি।
আর তুমি, মনে হচ্ছে তুমিই,
মেঝের ওপর জুতোর গোড়ালি ঘষছ।
ওঃ, তুমি অ্যাকটা ব্রুট!

আঃ পিতামহ, সাড়া দিচ্ছ না ক্যান?
তোমার শেষ প্রতিকৃতি দেয়াল থেকে উপড়ে
মাটিতে আছড়ে ফেললাম,
কিন্তু আমি কি ভুল করলাম?
কাউকে বিশ্বাস নেই
দুনিয়ার সব শ্লা দেয়াল সমান
এবং সব প্রতিকৃতি।

অ্যাখনও সূর্য

অ্যাখনও সূর্য বীর্যবান,
মহাদিগন্তে অ্যাখনও প্রাণ
উত্তিতীর্ষু নয় ফুরন্ত,
মহাসমুদ্র মহা দুরন্ত,
মহাপ্রাণিত হিরণ সূর্য,
মহা অরণ্যে হরিণ ভূর্জ;
কোটরে কোটরে দন্দশূক-
তবু সাধনায় জঞ্জপূক।

অ্যাখনও রোপানো মনাংকুর,
এবং স্থাবর ত্রিশংকুর
সব দ্বিধানোর শেষ ঘটানোর
সময়, অ্যাখন দীপচ্ছটানো,
অ্যাখন লোপানো ত্রস্ত ভয়,
বর্ণলীলার অস্ত নয় ;
কোটরে কোটরে দন্দশূক—
তবু সাধনায় জঞ্জপূক।

অ্যাখনও কবিতা এবং কবিতা
চিরদিদৃক্ষু স্বর্ণসবিতা ;
কাকে বলে ওরা অন্ধকার ?
সেও আলো সেও অন্তপার,
সেও জীবন্ত প্রস্ফুরন্ত
মহাসমুদ্র মহাদুরন্ত ;
কোটরে কোটরে দন্দশূক—
তবু সাধনায় জঞ্জপূক।

যখন তোমাকে

যখন তোমাকে পাই—কোন কথা নয়-
আনত হৃদয়টাকে সঁপে
নদীর জলের মতো গান গেয়ে উঠি।
তখন তোমাকে শুধু নয়—

দিনের সমস্ত সুখ, বাগানের ছড়ানো সৌরভ,
আকাশে জড়ানো রোদ, য্যান সোনা,
বন্ধুদের মধুর স্বাগত,
কফির পেয়ালা উপচে ফেনিল সুস্বাদ,
সবই পাই, সমস্ত পৃথিবীটাকে পাই।

যখন তোমাকে আমি হারাই
বুকের দেরাজ শূন্য, অন্ধ আমি,
ঘর য্যান নিতান্ত দেয়াল, রিক্ত,
মহেঞ্জোদড়োর কোন ভগ্নস্তূপ,
মরানদীহৃদয় বালুকা।
তখন তোমাকে শুধু নয়—
দিনের সোনালি রোদ, ফুলের বর্ণালি,
অতিথির কলরব, সমারোহ,
সব হারাই, সমস্ত সংসারটাকে হারাই।

তুমি শুধু তুমি নও,
আমি ও আমার
সমস্ত রুপোলি নদী, সব আকাশ, সকল অতিথি-
সব তুমি।

অগ্ন্যুত্‌পাতের পর

এখানে এইমাত্র অগ্ন্যুত্‌পাত ঘটে গ্যাছে।

প্লেটে খোসা-ছাড়ানো আম, রেকাবিতে এলাচ দারচিনি,
শ্বেতপাথরের ওপর তুমি মুখ থুবড়ে পড়ে আছ,
আমিই ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। সারা ঘরে
তীব্র আতরের সৌরভ। অসহ্য নাটকের
শেষ দৃশ্যের পরের দৃশ্য।
ঘড়ির কাচ মেঝেয় টুকরো টুকরো ছড়ানো,
এবং দেয়াল নির্বাক।

কনুইয়ে মুখ ডুবিয়ে তুমি কেঁদে উঠলে, অপমানিত।
তোমার দ্রৌপদী পিঠের ওপর খসখসে শ্যাম্পুকরা চুল,
য্যান সদ্যভাঙা পাখির বাসার খড়কুটো।
কনুইয়ের খিলানের ওপর তুমি ভগ্নস্তূপ দেউল, বিধ্বস্ত।
য্যান সারা পৃথিবীর ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছ
অধীশ্বরী ;
দুই বাহুর নিচে পূর্ব ও পশ্চিম গোলার্ধ
মাটিল্যাপা, ময়লা,
মেঝেয় সিল্‌ক ও নাইলনের বল্‌কল
তোমার গা থেকে জোর করে ছাড়ানো—
ফলের খোসার মতো।

তোমার উপছানো বীণাবাদিনী বুক, কান্নার্দ্র, কোমল,
আমি ছুঁয়ে দেখিনি—
এই প্রথম তোমাকে অস্পৃশ্য মনে হল।
আমি তোমায় অপমান করতে চাইনি
কিন্তু তুমি সম্পূর্ণ ভুল বুঝলে।
আত্মার আর অ্যাক নাম দেহ—তুমি জান না।
তোমার সেই ভাস্বর আত্মা
নাইলন রেশমের নামরূপ থেকে ছাড়িয়ে
আমি উন্মুক্ত করেছি,
তোমার স্বরূপকে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে এসেছি।
কিন্তু তুমি সম্পূর্ণ ভুল বুঝলে।

অ্যাখন তোমার কুমোরটুলি কপোলে
অন্য কোন দাগ নেই, শুধু কান্না।
সদ্যস্নানের পর এবং রেশম জড়ানোর আগে
তুমি য্যামন পবিত্র, আনকোরা,
ঠিক তেমনি কান্নার ফ্যানায় সদ্যধৌত
অ্যাখন তুমি সুন্দরী, স্বর্গোদ্যানের ইভ,
এবং তোমার কাছে দাঁড়িয়ে আমি নির্লোভ, উদাসীন, আত্মস্থ
আমার বাহু নিরুদ্যম, অপাপবিদ্ধ, এবং ঠোঁট নিরাকাংখি,
পৌরাণিক ঈশ্বরের মতো আস্থাবান, নির্বিকল্প আমি
তোমার কটিতে গ্রীবায় শ্যাম্পুকরা চলে
স্বর্গোদ্যানের শোভা দেখছি।

তোমায় অপমান করতে চাইনি,
তুমি সম্পূর্ণ অবুঝ, তাই ঘৃণা করছ।

কথা দিচ্ছি, এখ্‌খুনি তোমায় শ্বেত পাথরের ওপর ফেলে রেখে
হৃদয়হীন ঈশ্বরের মতো—হৃদয়হীনা ঈশ্বরী তোমার মতো—
খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাব,
ছোঁব না।
জানি, আমার ভারি জুতোর শব্দ সিঁড়িতে মিলিয়ে যাবার আগেই
তুমি আর অ্যাকবার নিজেকে ত্যক্ত উপেক্ষিত, অতএব অপমানিত
বোধ করবে-
আমি নিরুপায়।

তুমি জান না আত্মার আর অ্যাক নাম দেহ।

কনুইয়ে মুখ ডুবিয়ে তুমি আর অ্যাকবার যখন কেঁদে উঠবে
তখন মনে হবে এ বুঝি
অগ্ন্যুত্‌পাতের পর দ্বিতীয় অগ্ন্যুত্‌পাত,
কিন্তু আমি নিরুপায়।

বিদ্যুত্‌

ভেবেছিলে আমি মেঘ
কিন্তু দেখলে—
না, বিদ্যুত্‌।
যেই চমকালাম
তুমিও চমকালে।

অ্যাখন ঝড়ের মধ্যে
তুমি আমাকে নিয়ে
কি করবে ?

ওড়াতে গিয়েছিলে মুখের আঁচল
রবিঠাকুরের মতো,
কিন্তু খুলে পড়ল বুকের কাঁচুলি—
আমি নিজেই খুলে ফেললাম ।

অ্যাখন তুমি আমাকে নিয়ে
কি করবে ?
রবিঠাকুরের মতো কবিতা বানাবে না তো ?

প্রতিধ্বনি

আমার সমস্ত ডাক সে দ্যায় ফিরিয়ে
আমি তাকে পারি না ফেরাতে ।
আমি তবু কাছে যাই, পায়ে পায়ে ফিরি,
যখন সন্ধ্যার আলো আকাশের গায়ে
তারা হয়ে কাঁপে,
আমি ডাকি ।

রেলপুল পার হই ।
দূরের সিগনালে জ্বলে দূরের পিপাসা ।

বেলেঘাটা—ধুলোয় আবৃত পথ—
বিদ্যাধরী নদী—
আমি ডাকি,
অ্যাকে অ্যাকে সব ডাক ফিরে আসে,
সে দ্যায় ফিরায়ে,
নিষ্ঠুরা সে।

আমি তাকে দেখিনি কখনও,
শুধু ঘুমে ছাড়া,
কাচের চুড়ির মতো হাসি তার শুনেছি আড়ালে
মাটিতে লুকিয়ে রেখে অনাবৃত মুখ
চোখের কাজল মোছে চোখে ;
জানি না সে কাঁদে কি না বনের আড়ালে
দিগন্তের বিশাল প্রাচীরে পিঠ দিয়ে
আকাশের নিচে,
চোখে তার আকাংখার আলো
কাঁপে কি কাঁপে না—
জানি না।

আমি আর সেই নারী
মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি
ঝড়ের ধূসর-ঢালা সন্ধ্যায়
কতদিন,
কুয়াশায় হাত রেখে ডেকে গ্যাছি,
চোখে তাকে দেখিনি কখনও।

সে নিষ্ঠুরা প্রহেলিকা।
আমার সমস্ত ডাক, সব কথা, ক্যান যে ফিরায়
ক্যানই বা আমি তবু ডাকি,
ক্যান তবু, তারপরও, কাছে কাছে ঘোরে,
আমি যত দূরে যাই
ভাঙা প্রাচীরের কিংবা বটের আড়ালে,
মাঠের, নদীর, কিংবা রেলপুলের ধারে,
কে জানে হয়তো এই নিবিড় হৃদয়ে
আমার ঘুমের মধ্যে কান পেতে থাকে,
নিপুণ আগ্রহ নিয়ে
আমার সমস্ত ডাক শোনে।

তারপর সব ডাক ফিরে আসে
সব কথা সে দ্যায় ফিরায়ে,
আমি তাকে পারি না ফেরাতে।

ফ্রেজারগঞ্জে

সমুদ্র বানাতে
একটি ঢেউই যথেষ্ট
যদি যথেষ্ট নোনা হয়
এবং যথেষ্ট নীল।

নুন না হলেও চলে
যদি যথেষ্ট নীল থাকে,

অ্যামনকি নীল না হলেও ক্ষতি নেই
ঢেউই যথেষ্ট,
আর সামান্য কিছু লাল কাঁকড়া।

আর ঢেউ?
তারও দরকার করে না,
যদি—
তাছাড়া তুমিই তো রয়েছ।

সমুদ্রই যথেষ্ট
অথবা—
যদি—।

মাছরাঙা

জলে আমার ছায়াচিত্র
জলের গভীরে মাছ,
আমি বসে আছি তো আছিই—
কখন গভীর উঠে আসবে ওপরে,
দৃশ্য হবে, তারই অপেক্ষায়।

আমার গায়ের রামধনু
গায়েই রইল, এবং
আকাশের রং আকাশেই।
আমার মনের মধ্যে কেবল মাছের আঁশ
য্যামন খনির মধ্যে রুপো।

আমার পালকের বেশ কিছু রং
সর্বক্ষণ জলেই পড়ে আছে।
আর আমি ডুবে আছি
আমার মধ্যে আমার মনের মধ্যে,
য্যামন করে ডুবে আছে মাছ জলস্রোতে—
অবশ্য এ সবই যতক্ষণ না মাছ ভেসে উঠছে,
এবং ভেসে উঠলেই
ছোঁ মেরে আমাকে জলে নামাচ্ছে
(দৃশ্যত যদিও আমিই ছোঁ মারছি)
এবং ডোবাচ্ছে।

আসলে আমরা উভয়েই
অথৈ জলে।

যথারীতি

অ্যাখন আবার সব ঠিক, স্বাভাবিক,
পুবের সূর্য আবার পুবে, কলের জল ঠিক চারটেয়, এবং
কারখানার ভেঁপু ঠিক ছটা বাজার অ্যাক মিনিট আগে,
কারণ আমার ওয়েস্ট-এন্ড নিয়মিত অ্যাক মিনিট স্লো।
আবার খরশ্রুতি রেডিয়োর নব্-এ শব্দসুখী চম্পা,
এবং তার বোন যার নাম চকোলেট, এবং
সন্ধে সাতটায় ইংরেজির খই ফুটিয়ে স্কুটার ছুটিয়ে
ফুটফুটে সদ্যপাশ-মাস্টারমশাই।
(সেই দমকলের মতো মানুষগুলি, আশ্চর্য, কোথায় য্যান উবে গ্যাছে!)

অ্যাখন আবার সব ঠিকঠাক,
পাখিরা বাসায়, এবং পাখিদের বাসা উনিশ-ছুঁইদের শিরোভূষিকা ;
আবার কলিংবেলে মৃদু আঙুলের শক, ড্রেসিং টেবিলে
পাফ-বুলানোর ঘটা,
সিঁড়ির পা-পোশে পরিচিত খসখস, এবং
লেটারবক্‌সে আলাদিনের প্রদীপ।
(সেই মাইক-কন্‌ঠ মানুষগুলি কোথায় গ্যাল ?)

অ্যাখন আবার সব ঠিক, স্বাভাবিক,
টেলিফোনের হ্যালো-তে আবার উত্তাপ ফিরে এসেছে,
ট্যাক্‌সিতে মিটার উঠছে তো উঠছেই,
টাইপরাইটারের ওপর রন্‌জিত নখর ছোবল দিচ্ছে ;
অ্যাখন আবার চোখের নাম ইশারা, এবং কফি-হাউস স্বর্গ,
সন্ধ্যা অ্যাখন মৃদু এবং ঘাস আইসক্রিমের মতো নরম।
(সেই বিস্‌ফোরক মানুষগুলিকে আর দেখছি না।)

অ্যাখন আবার সব ঠিকঠাক,
আবার তারা শহরের দখল নিয়েছে যাদের চলা এবং বলা চমত্‌কার
পাইপ, ড্রেনপাইপ, টাই, বাটারফ্লাই, যাই হক
চুলে শ্যাম্পু, চোখে চোখছায়া, মেজাজ হালকা বা গম্‌ভীর,
তর্কের বিষয় আয়নেস্‌কো, আয়নস্‌ফিয়ার, কি ইলেকশন কিচ্ছু
যায়-আসে না

রাস্তায়, রকে, কি খ্যালার মাঠে
দুর্ধর্ষ, সাহসী, দুঃসমালোচক, সাঁতারু বা পাহাড়-চড়ুয়া,
ফুটপাথবাহার এই কুছপরোয়াদের আমার ভালই লাগে ;
ভাল লাগে তাদের যারা অবাক হয়, অবাক করে,

হঠাত্ হঠাত্ কবিতা আবৃত্তি করে ওঠে; গান গায়,
এরাই অ্যাখন কলকাতার পথঘাট রেস্‌তোরাঁর অধীশ্বর।
এবং তারা—রঙীন জলপ্রপাতের মতো উচ্ছল স্ফুটিত প্রজাপতিরা
যাদের সুন্দর সুন্দর নাম যুবকদের খাতায়, হাতের উল্‌কিতে, এবং
স্বপ্নের অন্ধকারে, ফসফরেসেন্‌ট অক্ষরে লেখা,
সেইসব রবীন্দ্রসংগীতমুখী কলেজে-কনভেন্‌টে-পড়া কিন্নরীরা
যারা নাচে এবং নাচায়, বাঁচে এবং বাঁচায়,
যাদের ঠোঁটে আলতা এবং হাসি এবং ঠাট্‌টা এবং বিদ্রূপ
এবং মোহ এবং প্রতিশ্রুতির সিলমোহর।
(কিন্তু কিম্‌ভূত-নাটকের-মহড়া-দিয়েছিল সেই মানুষগুলির কি হল ?)

অ্যাখন আবার সব ঠিক, স্বাভাবিক,
বাগানে বাতাবি লেবুর গন্ধ, গাড়িতে চেকার, মুক্ত অংগনে নবনাট্য,
দুধের বাটিতে মিনি, ভাঁড়ারে ইঁদুর, এবং
দোকানের শো-কেসে স্বপ্নসম্ভব শাড়ি, শাড়ি, শাড়ি।
অ্যাখন আবার পুবের সূর্য পুবে, কলের জল ঠিক চারটেয়,
এবং লংপ্লেয়িং-এ জ্যাজ ও পল রোবসন।
(সেই দমকলের মতো মানুষগুলি, আশ্চর্য, কোথায় য্যান উবে গ্যাছে !)

বাঙ্‌ময়

বৃক্ষ, তুমি কোথা থেকে ? তোমার কি ভাষা ?
রোদে-পোড়া স্বর—তোমার স্বরবর্ণ ।
শেকড় থেকে উত্থিত তোমার ফল—
প্রাচীনতম সংগীত ;
তুমি গম্ভীর, তুমি বিদ্যমান ।

নদি, তুমি কোথা থেকে ? তোমার কি ভাষা ?
জলে-ধোয়া তোমার তৃষ্ণা, মহাদেবের জটা থেকে
তুমি স্রোতের মধ্যে স্রোতস্বিনী
কলকণ্ঠ ;
তুমি প্রাণবতী, তুমি বহমানা ।

বৃক্ষ, আমরা ফলের প্রত্যাশী
নদি, আমরা জলের প্রত্যাশী
আমরা কোথা থেকে ? আমাদের কি ভাষা ?

অশ্বারোহ

রথের ম্যালায় কিনেছিলাম শব্দবিহীন ঘোড়া,
পোড়ামাটির, জমকালো রং-মোড়া ;
টি-ভি সেটের ওপর ছিল
টগবগিয়ে দাঁড়িয়ে নিস্তব্ধ
রেডি—কেবল রেসটি অনারব্ধ
বলেই দেরি, নইলে হত পথ-ওড়ানোর শব্দ :

আসলে এই দৌড়ি ঘোড়া মৃত
বেঁচে উঠবে মধ্যরাতের ব্যালা
আসলে এই দৌড়ি ঘোড়া প্রতীক
মূর্ত হবে মধ্যরাতের খ্যালায়
তুলকালাম তুরংগম হ্রেষে
স্বপ্ন ভেঙে পরী এবং ঘোড়া
ভিশন এবং টেলিভিশন ছিঁড়ে
বুকের ওপর অশ্ব অ্যাক জোড়া—

আমি যখন নিতান্ত অ্যাক হ্রদ
অশ্বখুরে সবেমাত্র খোঁড়া।

অলৌকিক ঘড়ি

সময় স্বয়ংক্রিয়-ঘড়ি অলৌকিক
যাকে কেউ বানায়নি।   সে নিজেকেই
কুড়িয়ে পেয়েছে, তুলে নিয়েছে
নিজের কুড়িয়ে পাওয়া জামার পকেটে
এবং ক্রমাগত হেঁটে চলেছে
ঠিক আমারই মতো
দ্রুত কখনও শ্লথ।

ডায়ালের ওপর
শুধু কয়েকটি সংখ্যা
এবং পরস্পরের সংগে
লুকোচুরি খ্যালার জন্য
দুটি মাত্র কাঁটা, কোন কোন
অলৌকিক মুহূর্তে বিবাহিত, আবার
পরক্ষণেই বিচ্ছিন্ন।

এই অযৌক্তিক অলৌকিক ঘড়ির
অদৃশ্য স্প্রিং-এর সংগে
সব হৃত্‌পিণ্ড বাঁধা

এবং সবাই ধুঁকছে।

উতল জংশন

বারে বারে ট্রেন এসে থামে
উতল জংশনে,
কি জানি কে নামে ?

দ্বিপ্রহর নিদারুণ জুন
আপ না ডাউন ?

আমার হৃদয়ে নেই সুখ
ক্যালেন্‌ডার মিথ্যুক মিথ্যুক !

সময়, কবচকুণ্ডল ও রক্তগোলাপ

হে সময়, হে অধীশ্বর মহাকাল,
আমার কবচকুণ্ডল, শৌর্যের উষ্ণীষ,
এবং রক্তগোলাপের ঝাড়
সবই তোমার বেদিতে নামিয়ে রাখতে হবে জানি,
কারণ তুমি নিষ্করুণ, লোভী, হৃদয়হীন।

অ্যাকমাত্র যে-অপরাধ আমি বুকে বয়ে ব্যাড়াই
তা হচ্ছে আমার হৃদয়, আমার স্বপ্নের বোরখার মধ্যে
অ্যাক লালিত মুখ, নদীর জলে সকালের জোয়ার।
সামনে মন-টানা দীর্ঘপথ কেবলই দীর্ঘতর
কখনও সেতুর ওপর লাফিয়ে কখনও সুড়ংগ ভেদ করে
কখনও উপত্যকা থেকে উপত্যকা অবিরাম।
নিজের মুখ আমি তাকিয়ে দেখতে পাই না
এজন্য আমায় কোন দুঃখ নেই, কারণ
আমি যখন নিজের মুখোমুখি তখনই বেজে ওঠে
তোমার অধীশ্বর কণ্ঠ, খসে পড়ে কবচকুণ্ডল, শৌর্যের উষ্ণীষ,
এবং রক্তে বোনা গোলাপের ঝাড়।

মহাকাল, পরাস্ত জটায়ুর সামনে রাবণের মতো
তুমি অ্যাকবার আমার সামনে এসে দাঁড়াবে, এবং
আমার অপহৃত আদর্শ সীতাকে নামমাত্র রথে চড়িয়ে
নিয়ে যাবে বিরহিণী বনে, বন্দিনী।

যখন স্তনগর্বিণী উনিশ আয়নায় দাঁড়িয়ে নিজেকেই হিংসে করেছে,
তুমি অদৃশ্য ভগবান কথা বল নি,
ঈর্ষালু কাপুরুষ, মেঘের আড়ালে বসে দিন গুনেছ,
তারপর প্রবঞ্চক প্রেমকে পাঠিয়েছ চতুর সুর্মা চোখে লাগিয়ে,
উনিশের পায়ে আনত বাইশ, সিঁড়িতে স্কুটার হেলানো,
টেনে এনেছ লেকে, সমুদ্রতীরে, শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত অন্ধকারে,
যুবকের করতলে তুলে দিয়েছ যুবতীকে, তার
মনোলোভা চোখ, বাহুসম্ভার, স্বপ্ন, ষড়ঋতু সব কিছু,
তারপর যখন সে হৃদয়-নিঃস্ব, দত্ত, ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠ, তখন

রংগমঞ্চে ডেকে এনেছ সদ্য-তেইশকে, যার খদ্যোত-চোখ-
ট্রিগারে টিপ করে ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকম্ অবধীঃ কামমোহিতম্।

হে সময়, হে অধীশ্বর মহাকাল,
ক্ষুধার্ত ওষ্ঠের ফাঁকে পনীর-টোস্টের মত নারীরা এসেছে
বুকের মধ্যে বয়ে এনেছে বোতলের মধু,
তাঁবু খাটিয়ে, ব্যান জিপসি, ছায়া বানিয়েছে আমার জন্য,
কোলের ওপর টেনে নিয়েছে কবিতাবন্দী কপাল, আমি
আমার বেহিসেবি ফাল্গুন, বৈশাখ, ভাদ্র উজাড় করে দিয়েছি
জলপ্রপাতের মধ্যে।
কখনও ঈর্ষা কখনও বিষাদ আমায় অধিকার করেছে, কিন্তু
রমণীয় ঋতুসংহারগুলি আমি উপেক্ষা করতে পারিনি।

যখন ইন্টারভিউ বোর্ডের মাননীয় সদস্যগণ
অ্যাকের পর অ্যাক প্রশ্ন করে আমায় খারিজ করে দিয়েছেন,
আমি লজ্জায় ক্ষোভে ফিরে গিয়েছি ফুটপাথে, তারপর
পার্কের বেন্‌চিতে বসে আদিগন্ত ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ক্লান্তি নিয়ে
অভিশাপ দিয়েছি অপমানিত নিজেকে।
দুপুর গড়িয়ে গ্যাছে বিকেলে এবং বিকেলের পর
রান্নাঘরের শেকল খুলে এসেছে স্বাদহীন রাত এবং
সেই বেকার মাঝরাতে স্বপ্ন দেখেছি রুদতী অ্যাক বালিকা
আমার কাছে হাত পেতে বলছে, 'সারাদিন কিছু খেতে পাইনি স্যার
হে সময়, হে অধীশ্বর,
আমার কবচকুণ্ডল, শৌর্যের উষ্ণীষ, এবং গোলাপ
আমায় অহংকারী করেছে তোমার বিরুদ্ধে, সাহস দেখিয়ে
নিয়ে গ্যাছে তুংগে, যেখানে শব্দ নিস্তরঙ্গ এবং নিঃশ্বাস স্তব্ধ,
আমি আকাশে মুখ রেখে চেঁচিয়ে বলেছি—'সময় তুমি নেই!'

যে-নারী ভালবেসে স্বপ্নে কথা বলে, এবং আমার
অক্লান্ত সমুদ্রতীরের ওপর দিয়ে হেঁটে সোজা চলে যায়
মংগলগ্রহের দিকে,
তারই চোখে বিস্মিত দেখেছি তোমার পরাজয়, এবং সেখানে
রোপণ করেছি আমার স্তব,
আমার কবিতা, আমার অহংকার।

যাবার আগে অন্ধকারে
আমি অ্যাকবার বোধিদ্রুমের ছায়ায় নম্র হয়ে দাঁড়াব,
ঘাতকের লালসা থেকে আহত পশুকে ছাড়িয়ে আনার সময়
ভয় বা জয়ের দিকে দৃকপাত করব না।
আমার কবচকুণ্ডল, উষ্ণীষ, রক্তগোলাপ
পৃথিবীর উঠোনে নামিয়ে রেখে কবুতর-সন্ধ্যায়
স্থির হয়ে দাঁড়াব, জোনাকিদের পুঞ্জ পুঞ্জ কোলাহল
শুনতে পাব, কিন্তু উত্তর দেব না, শুধু
তোমাকে শেষবারের মতো চমকে দিতে আবার তুলে নেব
কুণ্ডল, উষ্ণীষ ও রক্তগোলাপ।